ভূমিকা

আজাদী তথা স্বাধীনতার কথা বলে না তেমন মানুষ খুব কমই পাওয়া যাবে। তবে, নতুন কারো রাজনৈতিক শাসনে বা মরণের পরে আজাদীর কথা বলার রাজনৈতিক ফেরিওয়ালাও কম নয়। আবার, শাসকদেরকে দেশী –বিদেশী তকমা দিয়ে বিদেশী শাসক মুক্ত তাই স্বদেশী শাসকের অধীন দেশকে মুক্ত ও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে রাজনৈতিক প্রপাগান্ডা করার লোকেরও কমতি নাই। উপনিবেশিকতার নীতি ছিল পুঁজিতন্ত্রী সমাজ বিকাশে এক অবিচ্ছেদ্য নীতি। কিন্তু, এই নীতির অনুশীলনে পুঁজিতন্ত্রী সমাজ কেবল একটি বৈশ্বিক সমাজ হিসাবেই পরিণত ও বিকশিতই হয়নি বরং দুনিয়ার সর্বত্র পুঁজিপতির জন্ম হয়েছে বলেই নেটিভ পুঁজিপতিরা নিজ নিজ পুঁজির পরিমাণ বাড়াতে ও প্রসারে পুঁজিতন্ত্র পত্তনকারী বিদেশী পুঁজিপতিদের বিতাড়িত করতে উপনিবেশ বিরোধী সংগ্রামকে জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রাম হিসাবে দাবী করে উপনিবেশগুলোতে কথিত দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলের পত্তন করে নতুন নতুন রাষ্ট্র তৈরী করার লড়াইকে স্বাধীনতা ও মুক্তির লড়াই বলে চালিয়েছে যে রাজনীতিকেরা তারাও দাবী করে যে তারা স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামী বা দেশ বিশেষকে ভাগ–বিভাগ করে নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে সেটিকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করে সেই রাষ্ট্রের বাসিন্ধাদেরকে

স্বাধীন দেশের মুক্ত মানুষ হিসাবে দাবী করার লোকজনও কম নয়।

অন্যদিকে, পরাধীনতা হতে মুক্ত হতে আগ্রহী মানুষও কম নয় বলেই এত্তো এত্তো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সত্ত্বেও কথিত স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য সংগ্রামকারী ও যুদ্ধকারীদের অনেকে সহ অসংখ্য মানুষ দাবী করছে যে তারা এমন স্বাধীনতা ও মুক্তি চায়নি। ফলে, নতুন করে স্বাধীনতা ও মুক্তি দাবী করা মানুষজনদের উত্থাপিত দাবী দ্বারা এটাই প্রমাণিত ও নিশ্চিত হয়েছে যে অত্তোসব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেও কার্যত মানুষ মুক্ত হয়নি। অবার, সরকার বদল বা শাসক পরির্তন করার লড়াইকে দাবী করা হচ্ছে নতুন করে মুক্তি ও স্বাধীনতার লড়াই কিন্তু আদৌ কি কোনো নতুন রাষ্ট্র গঠন বা রাষ্ট্র বিশেষকে ভাগকরণ বা রাষ্ট্র বিশেষের সরকার পরিবর্তন বা শাসকের পরিবর্তন ইত্যাদি করা হলেই কি কার্যত মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জিত হয় না কি হয়েছে? অথচ, সেই দাস সমাজ হতে হাল আমলের অতি বয়োবৃদ্ধ পুঁজিতন্ত্রের কাল পর্যন্ত এত্তো এত্তো মানুষ স্বাধীনতা ও মুক্তি চাওয়া সত্ত্বেও এবং তদমর্মে দুনিয়ার অগণন মানুষ জীবন হারানো সহ অসংখ্য রকমের নির্যাতন ভোগ করা সত্ত্বেও মানুষ কেন এখন স্বাধীনতা ও মুক্তি চায় বা নিজেদেরকে পরাধীন বা বন্দী হিসাবে বিবেচনা করে বা কথিত ও দাবীকৃত স্বাধীনতা ও মুক্তির উল্লেখিত সকল রাজনীতি ও রাজনৈতিক দাবী কেন কার্যত ভুয়া বা ঝুট,

তার উত্তর খোঁজা হয়েছে “ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায় ” পুস্তকটিতে।

স্বাধীনতা শব্দটির উদ্ভব যেমন আদিম সমাজে হয়নি তেমন পরাধীনতা হতে মুক্ত হওয়ার চিন্তা তথা স্বাধীনতার আকাংখাও আদিম সমাজে জন্ম হয়নি। মুক্ত–স্বাধীন ও ন্যায্য সমাজ নয় কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভিত্তিক দাস সমাজ ছিল মানব জাতির ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা বা অনিবার্যতা। দাস সমাজে দাস মালিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল দাসেরা। দাসেরা ছিল শোষিত আর দাস মালিকেরা শোষক। সৃষ্টি হল শ্রেণীর। বিভক্ত হল মানুষেরা। মানুষ হারাল তার পরিচয়। অতঃপর, মানুষের স্বার্থে নয় বরং শ্রেণী স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হল মানুষের আদলে রহা বা মানব ছুরতে থাকা শ্রেণীগুলো। ফলাফল, শোষক তথা পরজীবী শ্রেণীর শ্রেণী শোষণ, শ্রেণী শাসন, শ্রেণী বিরোধ, শ্রেণী হিংসা, শ্রেণী বিদ্বেষ এবং শ্রেণী আধিপত্য ও শ্রেণী কর্তৃত্বের বিপরীতে শোষক দাস মালিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিত ও শাসিত দাস শ্রেণীর শ্রেণী সংগ্রাম ।

অতঃপর. দাস সমাজেই প্রথম মানুষ মানুষের যেমন শোষক হয় তেমন মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণকে বহাল রাখতে মানুষের শাসকও হয়েছিল মানুষ। তদানুযায়ী, মানুষ মানুষকে শোষণ–শাসনে প্রতিষ্ঠিত হয় রাষ্ট্র ও পরিবার। অতঃপর,

ব্যক্তিগত সম্পত্তিকেতো বটেই উপরন্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তির শর্তে ও সম্পত্তিবানদের সংকীর্ণ স্বার্থে কার্যত ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে উৎপত্তিকৃত পরিবার ও রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র পরিচালনাকারী কর্তৃত্ব ও কর্তৃপক্ষের শাসন ক্ষমতা ও শাসন ক্ষমতার উৎসকে গ্রাহ্যতা, ন্যায্যতা, বৈধতা, কার্যকরতা ও বহাল রাখতে ও দিতে সূচিত ও প্রবর্তিত হয় রাজনীতি, আইন, রীতি-নীতি, নৈতিকতা- সংস্কৃতি ইত্যাদি। ফলে, রাষ্ট্রবাসী সকলে রাষ্ট্রের অধীন হয়ে খোদ রাষ্ট্রাধিপতি সমেত সকলেই হয়ে পড়ে রাষ্ট্রীয় আইন-বিধি ও নিয়ম-নীতি, প্রথা ও ঐতিহ্যের অধীন সে অর্থে রাষ্ট্রবাসী সকলেই হয়েছিল পরাধীন।

কিন্তু, রাষ্ট্রাধিপতি তথা রাজা-বাদশারা যেহেতু নিজেই রাষ্টের মালিক ছিল এবং তারাই তৈরী করত বা করাত আইন-বিধি, নিয়ম-নীতি ইত্যাদি এবং সেসব কার্যকরীও করত রাজা-বাদশারা ফলে, রাজা-বাদশারা মানুষ হওয়া সত্ত্বেও গণ্য হত বটে মহামানব বা অতিমানব বা অসাধারণ কেহ একটা বিশেষ হিসাবে আর শোষিত-শাসিতরা ছিল সাধারণ।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তিবানদের পরজীবীতার স্বার্থে তাদের রাজনৈতিক ভৃত্য -শাসকেরা তথা রাজা-বাদশারা তথা মুখ্য শাসকেরা বা তাদের সহযোগীরা তৈরী করত বটে আইন-কানুন, রীতি-নীতি, রাজনৈতিক

বিবৃতি, মতাদর্শ, দর্শন ইত্যাদি । অতঃপর, ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে উৎপত্তিকৃত ও ব্যক্তিগত সম্পত্তিবানদের সংকীর্ণ স্বার্থ হতে উদ্ভূত ও জারীকৃত এবং বহালকৃত আইন-কানুন, রীতি- নীতি, রাজনীতি, দর্শন, মতাদর্শ, প্রথা, সংস্কৃতি ইত্যাদি সৃজিত ও প্রবর্তিত হয়েছিল মানুষ কর্তৃক মানষকে শোষণ-শাসনে বন্দী তথা শৃংখলিত করার শিকল হিসাবে। সুতরাং, যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হল তখন শ্রেণীর উদ্ভব হল আর শোষক-শাসক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা ও সংরক্ষায় উৎপত্তি হলে রাষ্ট্র, পরিবার, রাজনীতি, আইন, রীতি-নীতি ইত্যাদি মতো শিকলগুলো আর এসব শিকলে বন্দীরা হল পরাধীন। ফলে, খুব স্বাভাবিকভাবে বন্দীত্ব হতে মুক্তির আকাংখা তৈরী হল বন্দীদের মধ্যে সেই দাস সমাজেই।

শোষক-শোষিত শ্রেণীতে বিভক্ত দাস সমাজে মানুষে মানুষে কেবল ভাগ-বিভাগ ও প্রভেদই নয় বরং দেখা দিল অসংখ্য রকমের বৈষম্য। অতঃপর, মানুষে মানুষে ভাগ-বিভাগ, বিভেদ- প্রভেদ, বিরোধ-বৈরীতা, অসাম্য ও বৈষম্য ইত্যাদি রক্ষা ও সংক্ষার অসংখ্য শিকলের এক বিরাট বোঝা হল রাষ্ট্র যা মানুষকে তার স্বাভাবিক চলা-ফেরা ও বেঁচে থাকার প্রাকৃতিক অধিকার হতে বঞ্চিত করে মৃত্যুদন্ড সহ নানান রকম দন্ড দিতে স্বীকৃত , যোগ্য , সক্ষম ও কার্যকর এক যন্ত্র অর্থাৎ রাষ্ট্র হচ্ছে শোষক-শাসকশ্রেণীর একটি সর্বাধিক শক্তিশালী পীড়ন যন্ত্র।

অতঃপর, মানুষ কর্তৃক মানুষকে পীড়ন ও দমনের মাধ্যমে শাসনের জন্য শৃংখলিত করার মাধ্যমে শোষকদের সম্পত্তি রক্ষা করার মাধ্যমে শোষক শ্রেণীর পরজীবিতার সংকীর্ণ স্বার্থের সেবা করতে রাষ্ট্র হচ্ছে শোষক–শাসক শ্রেণীর শোষণ–শাসন বহাল ও বলবৎ রাখার এক শ্রেণী হাতিয়ার। তাই, রাষ্ট্র হচ্ছে মানবতা বিরোধী এক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যার প্রয়োজনীতা ও উপযোগীতা আছে কেবল শোষক–শাসক শ্রেণীর নিকট। অতঃপর,ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে সৃষ্ট মানুষে মানুষে অসাম্য ও বৈষম্যের ফল – রাষ্ট্র নিজেই জন্মগত শর্তে অসংখ্য অসাম্য ও বৈষম্যে ভরপুর একটি শক্তিশালী তবে শোষক–শাসক শ্রেণীর একটি শ্রেণী হাতিয়ার।

দাস মালিকদের শোষণমূলক তথা পরজীবিতার স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র তদীয় ব্যয় নির্বাহে রাষ্ট্রাধিপতিরা খাজনা আদায় এবং লুণ্ঠনও করত। খাজনা পরিশোধে ব্যর্থ বা অস্বীকৃতকে বা রাষ্ট্রের আইন–বিধি ও নিয়ম–নীতি বা হুকুমাদি অমান্যে বা অস্বীকৃতিতে বা ভংগ করলে রাষ্ট্রের অধিপতি–রাজা ও বাদশারা তথা শাসকেরা মৃত্যুদন্ড সহ যে কোনো ধরণের দন্ড দিতে পারত এবং দিত বটে দাস মালিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা ও সংরক্ষায়। অতঃপর, রাষ্ট্র জন্ম নিয়েছিল কার্যত শোষক শ্রেণীর সংকীর্ণ স্বার্থ রক্ষায় শোষিত শ্রেণীকে দমন–পীড়ন করতে। সুতরাং, রাষ্ট্র জন্মসূত্রেই হচ্ছে শোষক–শাসক শ্রেণীর সর্বাধিক শক্তিশালী পীড়ন যন্ত্র।

ভূমি দাসত্বের সামন্ত সমাজের ধ্বংসস্তুপ হতে উত্থিত তবে মজুরি দাসত্বের আধুনিক পুঁজিতন্ত্রী সমাজও ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভিত্তিক বিধায় ইহাও শোষণমূলক ও শ্রেণী বিভক্ত সমাজ। তাই, এখানেও শোষক–পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থে রাষ্ট্র বিদ্যমান সাথে পুঁজিতন্ত্রের উপযোগী ও পুঁজিতন্ত্রের সৃষ্ট আরো নানান রকম রাজনীতি, দর্শন, মতাদর্শ, আইন–কানুন, রীতি–নীতি, প্রথা– সংস্কৃতি ইত্যাদি নিয়ে। তাই, আধুনিক তবে বৈশ্বিক পুঁজিতন্ত্রে পুঁজি উৎপন্নকারী মজুর শ্রেণী যেমন শোষিত শ্রেণী তেমন শাসিত শ্রেণী। কিন্তু, দাস ও সামন্ত সমাজের চেয়ে মজুরি দাসত্বের আধুনিক শিল্প ভিত্তিক পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ তুলনাহীনভাবে অধিকতর উন্নত হলেও এখানে বহু রাষ্ট্র সমেত বহু রাষ্ট্রজীবী, অসংখ্য রাজনৈতিক দল সমেত পেশাদার রাজনীতিক পরজীবী, অসম প্রতিযোগীতাসহ নানান কারণে ক্ষত–বিক্ষত পুঁজিতন্ত্রকে হেফাজত করতে কর্মরত অসংখ্য তথাকথিত উন্নয়ন সহযোগী ও মানবাধিকার সংগঠনের আরো অসংখ্য পরজীবী কর্মকর্তা–কর্মচারী এবং জাতিসংঘ ও আই এম এফ সহ নানান পুঁজিতান্ত্রিক বৈশ্বিক সংগঠনের বহু পরজীবী কর্মকর্তা ও কর্মচারী সহ পুঁজিতান্ত্রিক সম্পত্তির মালিক– পুঁজিপতি শ্রেণী তথা শোষক–পরজীবী ইত্যাদি মিলে নজিরবিহীন এক বিরাট সংখ্যক পরজীবীর ভারে মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্র এত্তোটাই বিধ্বস্ত, জর্জরিত ও বিপন্ন যে অগণন পণ্যের ভয়ানক প্রাচুর্য্যের এই পুঁজিতন্ত্রী সমাজ তার

উৎপাদক শ্রেণী তথা মজুর শ্রেণীর উপযুক্ত ভরণ–পোষণেও অযোগ্য ও অক্ষম।

অথচ, পুঁজিপতিদের কেহ কেহ বিবাহ বা বিবাহ বার্ষিকী উদযাপন সহ আরো নানান অহেতুক বিষয়েও খরচ করে বটে শত শত কোটি ডলার। আবার, মজুর শ্রেণীর উৎপন্ন উদ্বৃত্ত–মূল্যের অংশ বিশেষ বৈ পুঁজিতন্ত্রী রাষ্ট্রের যাবতীয় ব্যয় আর কিছুই না যা সরকার আয় করে বটে রাজস্ব হিসাবে।তবে, শোষিত শ্রমিক শ্রেণীকে দমন–পীড়নে শোষক–শাসক পুঁজিপতি শ্রেণীর সর্বাধিক শক্তিশালী যন্ত্র –পুঁজিতন্ত্রী রাষ্ট্রের সকল খরচ নির্বাহ করে বটে মজুর শ্রেণী। পুঁজিতন্ত্রী বিশ্বের সকল পুঁজিতন্ত্রী রাষ্ট্রের মোট ব্যয়ের পরিমাণ হচ্ছে বিশ্বের মোট জিডিপির ২৯% এর কিছু বেশী। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে বিশ্বের মোট জিডিপি ছিল ১০৫ ট্রিলিয়ন ইউ এস ডলার।

উল্লেখ্য, দাস সমাজ, সামন্ত সমাজ ও পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে সৃষ্ট, বহাল ও বিদ্যমান সকল ধরণের তথা উপরে উল্লেখিত শিকলসমূহ বিলীন ও বিলুপ্ত না করে কি মানবজাতি মুক্তি ও স্বাধীনতা তথা আজাদী লাভ করতে পারে? না। অথবা, মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ ও শাসন বহাল থাকলে কি কোনো মানুষ মুক্ত ও স্বাধীন হতে পারে? প্রশ্নই উঠে না। অথবা, ব্যক্তিগত বা পুঁজিতান্ত্রিক সম্পত্তি, পরিবার, রাষ্ট্র,

জাতিসংঘ সহ নানান পুঁজিতান্ত্রিক বৈশ্বিক সংগঠন এবং তথাকথিত উন্নয়ন সহযোগী বা দাতা বা অধিকার সংগঠন, রাজনৈতিক দল ও সংগঠন ইত্যাদি বহাল রেখে কি কারো মুক্তি ও স্বাধীনতা হাসিল করা সম্ভব? না। অথবা, পুঁজিতান্ত্রিক সম্পত্তি বিলোপ করার মাধ্যমে পণ্য, পুঁজি, বেচা-কেনা, মজুরি দাসত্ব, শ্রেণী , শ্রেণী শাসন ইত্যাদি বিলোপ করা বৈ বহাল রেখে কি কারো মুক্তি বা স্বাধীনতা অর্জিত হতে পারে? না।

উল্লেখ্য, পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানা সমেত নানান ধরণের মালিকানার প্রবর্তন করে পুঁজিতন্ত্রী সমাজকে রক্ষা করার অপচেষ্টা করছে বটে পুঁজিতন্ত্রী সমাজ সচল ও শাসনে অযোগ্য, ব্যর্থ ও অক্ষম তবে প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণী। অতঃপর, কেবল ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক নয় বরং পুঁজিতান্ত্রিক সম্পত্তি ভিত্তিক সমাজ হচ্ছে পুঁজিতন্ত্রী সমাজ। অর্থাৎ, পুঁজি গঠন বা উৎপন্নে ব্যবহৃত সম্পত্তি তা হোক ব্যক্তিগত বা সমবায়িক বা রাষ্ট্রিক বা বহুজাতিক বা পুঁজিতান্ত্রিক বৈশ্বিক সংস্থার মালিকানাধীন সম্পত্তি তাহাই হচ্ছে পুঁজিতান্ত্রিক সম্পত্তি।

শোষণমূলক ও শ্রেণী বিভক্ত, বৈষম্য ও আসাম্যে এবং পরাধীনতার সমাজ তথা মানুষ কর্তৃক মানুষের শাসনের সমাজ দাসতন্ত্র যেমন টিকেনি বা স্থায়ী হয়নি তেমন স্থায়ী হয়নি সামন্ত

সমাজ তাহলে শোষণমূলক ও শাসনমূলক তথা মানুষ কর্তৃক মানুষের শাসনের সমাজ– পুঁজিতন্ত্র চিরস্থায়ী হবে কেন? উল্লেখ্য, পুঁজির অস্তিত্বের শর্তাবলী হচ্ছে পুনোরুৎপাদন ও সঞ্চালন । পুনোরুৎপাদনের ফল হচ্ছে অতি উৎপাদন আর অতি উৎপাদনের ফলে পণ্যের মজুত বৃদ্ধি হয়, যাতে সংকট সৃষ্টি হয় পুঁজির সঞ্চালনে যার পরিণতি মন্দা আর মন্দার ফলাফল– নৈরাজ্য সমেত ব্যক্তিগত মালিকানার সংকোচন বা হ্রাসকরণ এবং একই সাথে সামাজিক মালিকানার পথ প্রশস্তকরণ। আবার, পুঁজিপতি শ্রেণীর টিকে থাকার শর্তাদি হচ্ছে উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন সম্পর্কাদির এবং সেই সাথে সমাজের পুরো সম্পর্কের অবিরাম বৈপ্লবীকরণ। অতঃপর, পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে; এবং পুঁজিপতি শ্রেণীর টিকে থাকার শর্তাদির কারণে সৃষ্ট পুনঃপুন মন্দার হেতুবাদে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে পুঁজিপতি শ্রেণীর চাপিয়ে দেওয়া তবে পুঁজি উৎপন্নকারী শ্রমিক শ্রেণীর একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিতন্ত্রী সম্পত্তি ও পুঁজিতন্ত্র বিলীন হবে। তাতে, পুঁজি ও পুঁজিপতি শ্রেণী অদৃশ্য ও বিলুপ্ত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে এক নতুন সমাজ–কমিউনিজম যার ভিত্তি– সামাজিক মালিকানা।

সুতরাং, পণ্য ও বেচা–কেনা মুক্ত তাই, শোষণ– শাসন মুক্ত তাই, শ্রেণীমুক্ত সুতরাং মানুষ কর্তৃক মানুষকে বন্দী ও শৃংখলিত তথা পরাধীন করতে দাস সমাজ হতে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে যত ধরণের শিকল তৈরী হয়েছে ও হবে এবং

সেসকল শিকলাদি তথা আইন, কানুন, রীতি–নীতি, ঐতিহ্য, প্রথা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, দর্শন, মতাদর্শ ইত্যাদিকে কার্যকরী ও বহাল করতে আইএমএফ সহ বিদ্যমান সকল পুঁজিতান্ত্রিক বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল, পরিবার ইত্যাদি হতে মুক্ত বটে কমিউনিস্ট সোস্যাইটি হচ্ছে পুঁজিতন্ত্রী সমাজের ঐতিহাসিক পরিণতি। তাই, পুঁজিতন্ত্রের পতন ও কমিউনিজমের উত্থান হচ্ছে সমানভাবে অনিবার্য্য ও অপরিহারযোগ্য। অতঃপর, কমিউনিস্ট সমাজ হচ্ছে মানুষ কর্তৃক মানুষের শাসন মুক্ত তাই স্বাধীন ও মুক্ত মানুষদের এক মুক্ত–স্বাধীন ও মানবিক তথা সম্পূর্ণ মানবিক বোধে পরিপূর্ণ এক অবিভক্ত ও একক মানবজাতির এক মানবিক সমাজ যা হচ্ছে শ্রেণী বিভক্ত মানবজাতির ভবিতব্য।

উল্লেখ্য, দাস সমাজেই স্বাধীনতা ও মুক্তির আকাংখা তৈরী হলেও পুরনো সমাজের মধ্যে তৈরী হওয়া উৎপাদনের উপায়ের সাথে বিদ্যমান সামাজিক সম্পর্কের বিরোধ ও বৈরীতার ফল হচ্ছে নতুন সমাজ। সমাজ পরিবর্তনের এই নিয়মেই দাস সমাজ বিলুপ্ত হয়ে তৈরী হয়েছে সামন্ত সমাজ আর সামন্ত সমাজের ধ্বংসস্তুপ হতে উত্থিত হয়েছে আধুনিক শিল্প ভিত্তিক আধুনিক তবে হালে মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্রী সমাজ। কিন্তু, উল্লেখিত ৩ টি সমাজই শোষণমূলক ও শ্রেণী বিভক্ত সমাজ।তাই প্রথম দুটি সমাজের মতোই তৃতীয় সমাজটিও শাসক শ্রেণী ও তাদের তৈরী রাষ্ট্র, পরিবার, মতাদর্শ,

রাজনীতি, আইন, রীতি-নীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি অসংখ্য শিকল হতে মুক্ত হতে পারেনি বা হবেও না।

ফলে, দাস সমাজ হতে এযাবৎ কাল পর্যন্ত যে যত রকমের স্বাধীনতা ও মুক্তির কথাই ওরা বলে থাকুক না কেন কার্যত, উল্লেখিত সমাজসমূহে কেহই মুক্ত ও স্বাধীন হওয়ার সুযোগ ছিল না এবং নাই। কারণ, ৩টি শ্রেণী বিভক্ত সমাজই ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভিত্তিক। তাই, আগের দুটি সমাজের মতোই ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভিত্তিক পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের সকলেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির শিকলে বন্দী।

কিন্তু, পুঁজিতন্ত্রে পুঁজি ও পুঁজিপতি শ্রেণীর টিকে থাকা ও অস্তিত্বের শর্তে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের যন্ত্রপাতির বিরতিহীন বৈপ্লবিকীকরণের মাধ্যমে নিয়ত অত্যাধুনিক উৎপাদন যন্ত্র উদ্ভাবন; শোষক পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণীর বিশেষ প্রোডাক্ট- মজুর শ্রেণীর উৎপন্ন পুঁজি কার্যত ব্যক্তিমালিকানার আবশ্যকতা ও উপযোগীতাকে অসার ও অপ্রয়োজনীয়তাকে নিশ্চিতকরণ; এবং ক্রমাগত উৎপাদনের অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও সৃষ্টি করে তা ব্যবহার উপযোগী সামাজিক মালিকানা ভিত্তিক একটি বৈজ্ঞানিক ও মানবিক সমাজের সকল শর্তাদি ও খুঁটি তৈরী করে বিদ্যমান পুঁজিতন্ত্রী সমাজের অভ্যন্তরে ক্রমাগত উৎপাদন সম্পর্কের সহিত উৎপাদনের আধুনিক যন্ত্রপাতির বিরোধ ও বৈরীতা সৃষ্টি করার মাধ্যমে পুঁজিতন্ত্রের অক্ষমতা,

অপ্রয়োজনীয়তা ও ক্ষতিকরতা নিত্য হাজির করার হেতুবাদে; এবং পুঁজিতন্ত্রের নিরাময় অযোগ্য ব্যাধি– মন্দায় সৃষ্ট পুঁজিতন্ত্রের গভীর সংকটাপন্ন ও বিপন্নাবস্থায় পুঁজির জন্মসূত্রে বিরোধে লিপ্ত পুঁজিপতি শ্রেণী ও মজুর শ্রেণীর বিরোধের পরিণতি– কমিউনিস্ট সমাজের উপযোগীতা ও আবশ্যকতা ক্রমাগত সামনে হাজির করছে।

তাই, পুঁজির জন্মসূত্রে বিরোধ ও বৈরীতায় লিপ্ত পুঁজিপতি শ্রেণী ও মজুর শ্রেণীর বিরোধের অবসানে পুঁজি উৎপাদনকারী মজুর শ্রেণী তার নিজের মুক্তির জন্য পুরো সমাজকে মুক্ত করতে পুঁজিপতি শ্রেণী ও মজুর শ্রেণীর চূড়ান্ত বিরোধ– একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিতান্ত্রিক সম্পত্তি বিলীন করে সামাজিক মালিকানার একটি মুক্ত ও স্বাধীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত করবে। ফলে,পরিবর্তন হলেও অতীতের সমাজ গুলোতে যেমন মুক্ত হওয়ার উপযুক্ত শর্ত ও খুঁটি তৈরী হয়নি তেমন কমিউনিজমের ভিত্তি – পুঁজিতন্ত্রও একটি মুক্ত ও স্বাধীন সমাজ হতে পারেনি এবং হবে না। কিন্তু, পুঁজিতন্ত্রের পতন ও কমিউনিজমের উত্থান সমানভাবে অনিবার্য করছে বটে খোদ পুঁজিতন্ত্র। কাজেই, আজাদী বিষয়ে অতীতের সৃজিত রাজনৈতিক ধারণাসমূহ বা রাষ্ট্রের মাধ্যমে আজাদী হাসিল বা শাসক পরিবর্তনের মাধ্যমে আজাদী লাভের সকল রাজনৈতিক বক্তব্য বা প্রপাগান্ডা হচ্ছে ভুয়া অর্থাৎ ঝুটা।

অতঃপর, আবশ্যকীয় তথ্য–উপাত্ত সমেত প্রামাণ্য দলিলাদির দ্বারা বইটিতে আজাদী বিষয়ে রাজনীতিকদের ভুয়ামি প্রমাণ করা সহ প্রত্যেকের স্বাধীনতা ও মুক্তির তথা আজাদীর সমাজ– কমিউনিজমের উত্থান, অপরিহার্য্যতা ও অনিবার্যতা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ ও নিশ্চিত করা হয়েছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: পুস্তকটি লেখা শেষ হয়েছিল ০১, জুন, ২০২৩ খ্রীষ্ট্রাব্দে এবং ফেসবুক সহ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল । কিন্তু, শ্রমিকদের মুক্তির জন্য তথ্য কেন্দ্রের ওয়েবসাইট : **www.icwfreedom.org** এ বইটি আপলোড করার জন্য একটি ভূমিকা লেখার সময়কালে বইটিতে বানান সহ কিছু ভুল–ভ্রান্তি আমাদের নজরে আসায় তা সংশোধন করা হয়েছে। তারপরও যদি আরো কোনো ভুল–ত্রুটি কারো নজরে আসে তবে তা সংশোধনে আমরা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তি বর্গের পরামর্শ ও সহযোগীতা সাদরে গ্রহণ করব।

শাহ্ আলম

ঢাকা– ০২, সেপ্টেম্বর, ২০২৪খ্রীঃ।

ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়

“ ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায় , লাখো ইনসান ভুখা হ্যায় ”- একটি রাজনৈতিক স্লোগান তথা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত যা ২৮শে ফেব্রুয়ারী হতে ৬ই মার্চ -১৯৪৮ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত হয় এবং ইহা বি.টি. রণদিভে লাইন হিসাবে পরিচিত। উক্ত কংগ্রেসেই পি.সি. যোশীর স্থলে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিল বি.টি. রণদিভে। উল্লেখ্য, এই কংগ্রেসেই বিভক্ত ভারতের দুটি দেশ অর্থাৎ ভারত ও পাকিস্তান ভিত্তিক দল গঠনের জন্য সিপিআইকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে, কমিউনিজম প্রতিষ্ঠায় একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য দুনিয়ার মজুরদেরকে একতাবদ্ধ করার জন্য শ্রমিক শ্রেণীর একটি বৈশ্বিক পার্টি- কমিউনিস্ট পার্টি নয় বরং পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন পদ্ধতিকে টিকিয়ে রাখতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের জন্য গঠিত বহু শ্রেণীর (মাল্টি ক্লাস) দেশ ভিত্তিক ও দেশবাদী একটি পার্টি- সিপিআই দেশ ভাগের সাথে মিল রেখে দল ভাগ করেছে।

অতঃপর, ধর্ম কেন্দ্রীক দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভক্তি সমর্থন ও তা বাস্তবায়নে কাজ করে সিপিআই কার্যত একটি সাম্প্রদায়িক দল হিসাবেও নিজেকে প্রতিপন্ন করেছে। মজুরদের মুক্তির জন্য আবশ্যক দুনিয়ার শ্রমিকদের বৈশ্বিক একতার পথে বড় রকমের বাধা ও প্রতিবন্ধকতা তৈরীতেও

কার্যকরী তথা নতুন নতুন রাষ্ট্র গঠন করে বা পুরোনো অকার্যকর রাষ্ট্র বিভক্ত করে দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে বহুধা ভাগে বিভক্তকরণের যে নীতি দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ জয়ী শাসকেরা নিয়েছিল শ্রমিকদের জন্য ভয়ানক ক্ষতিকর সেই নীতির সফল বাস্তবায়নে অখন্ড ভারতের শ্রমিকদেরকেও ভাগ-বিভাগ ও বিভক্ত করার সেই নীতিই সিপিআই কার্যকরী করেছিল খোদ সিপিআইকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

উল্লেখ্য, লেনিনের পরিকল্পনায় রাতের আঁধারে একটি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ১৯১৭ সালে রাশিয়ার রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিতন্ত্রী বলশেভিক পার্টি। লেনিনের কর্তৃত্বাধীন সরকারের পরিচালনাধীন সংবিধান সভার নির্বাচনে লেনিনের সরকার রাশিয়ার ভোটারদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়। কিন্তু, রাশিয়ার ভোটারদের মতামতকে পাত্তা না দিয়ে বরং লেনিনের দীর্ঘদিনের প্রতিশ্রুত নির্বাচিত সংবিধান সভাকে খোদ লেনিন তার স্বীয় প্রতিশ্রুতি ভংগ করে বাতিল করে নির্বাচনে বিজয়ী দলকে গৃহযুদ্ধে ঠেলে দিয়ে রাশিয়ায় একটি রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রী রাষ্ট্র তথা সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা জাতীয়তাবাদী ও রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রী লেনিনের নীতির অনুসরণে; এবং খুবই নিকৃষ্ট পুঁজিতন্ত্রের একটি চরম নিকৃষ্ট রূপ -রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রকে সমাজতন্ত্র বলে চিহ্নিত করে এমনকি পুঁজিতন্ত্র বিষয়েও মিথ্যাবাদী লেনিন সুপ্রিম অটোক্রেট-জারের সেনাবাহিনীকে নিজের বাহিনী বানিয়ে তার সেনা আধিপত্যের চরম স্বৈরতন্ত্রের ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে সোভিয়েতের বাহিরে নানান দেশে তার রাজনীতি ও রাষ্ট্রের সমর্থক

রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তোলার পলিসি অনুযায়ী এবং স্বয়ং লেনিনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভুমিকা ও সহযোগীতায় গড়ে উঠেছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সিপিআই নামীয় চরম প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া দলটি।

তাই,জন্মসূত্রেই সিপিআই হচ্ছে একটি লেনিনবাদী দল। তবে,সকল লেনিনবাদী দলের অরিজিন হচ্ছে বলশেভিক পার্টি যা প্রতিষ্ঠাকালীন ঘোষণাপত্র মূলে একটি চরম প্রতিক্রিয়াশীল পার্টি এবং কেবলমাত্র রাশিয়ার একটি রাজনৈতিক পার্টি। আর আজাদী তথা স্বাধীনতা বা মুক্তি বিষয়ে বর্ণিত মত হচ্ছে লেনিনবাদী দল- সিপিআইয়ের। আসলে, লেনিনবাদীরা বর্বর দাসযুগের ততধিক বর্বর শাসকদের রাজনৈতিক বোধ ও চিন্তায় আচ্ছন্ন বলে অসংখ্য পণ্যের তবে কৃত্রিম দারিদ্রতা সমেত আধুনিক ও প্রাচুর্য্যময় সমাজ- আধুনিক পুঁজিতন্ত্রেও উদর পূর্তিকেই স্বাধীনতা হিসাবে চিহ্নিত করে।

সিপিআইও তার দ্বিতীয় কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে , যেহেতু ভারতের লাখ লাখ মানুষ অভুক্ত বা ক্ষুধার্ত থাকে সেহেতু, কথিত সদ্য স্বাধীন ভারত রাষ্ট্র স্বাধীন নয়। কাজেই, সিপিআইয়ের রাজনৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে ভারতের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে ভারতের অনাহারীদের মুখের আহার নিশ্চিত করে ভারতকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু, বেচা-কেনা ভিত্তিক পুঁজিতন্ত্রে যার টাকা আছে তার পণ্য কেনার স্বাধীনতা আছে। আর যার টাকা নাই তার পণ্য কেনার স্বাধীনতাও নাই। ভারততো বিশ্ব পুঁজিতন্ত্রী সমাজেরই একটি

দেশ ছিল বটে ১৯৪৭ সালের আগে এবং পরে এবং এখনো তাই আছে।

পুঁজিতন্ত্রী সমাজে পণ্য তথা মূল্য অতঃপর, উদ্বৃত্ত-মূল্য তথা পুঁজি উৎপন্ন করে শ্রমিক শ্রেণী। কিন্তু,পুঁজির মালিক হচ্ছে পুঁজিপতি শ্রেণী যা শোষকদের তৈরীকৃত আইনে বৈধ কিন্তু সম্পূর্ণত অযৌক্তিক, অন্যায় ও অন্যায্য তাই, পুঁজিতন্ত্রী সম্পত্তি হচ্ছে বিদ্যমান সকল দুস্কর্মের কারণ। মুনাফা, সুদ সমেত উল্লেখিত অযৌক্তিক, অন্যায় ও অন্যায্য পুঁজির অংশ বিশেষ হচ্ছে খাজনা, কর , শুল্ক ইত্যাদি যা রাষ্ট্রীক ক্ষমতা বলে রাষ্ট্রের নির্বাহীগণ স্থির করে এবং নির্বাহীদের কর্তৃত্বাধীনে সরকারীভাবে তা আদায় ও উসূল করা হয় রাষ্ট্রের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য। অতঃপর, রাষ্ট্রের আয়কৃত রাজস্ব হতে পুঁজিতন্ত্রী রাষ্ট্রের সকল ব্যয় বহন করা হয়। সুতরাং, অন্য কেহ নয় বরং রাষ্ট্রের সকল ব্যয় বহন করে বটে পুঁজি উৎপন্নকারী শ্রমিক শ্রেণী। ফলে, পুঁজিতন্ত্রে রাষ্ট্রের নির্বাহীগণ ও কর্মীগণের ব্যয়ও নির্বাহ করে বটে শোষিত শ্রমিক শ্রেণী। তাই, পুঁজিতন্ত্রী স্বার্থের রাজনৈতিক সেবক ও চাকুরেরাও শোষক পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণীর অংশ।

দাসতান্ত্রিক সমাজেও শাসকেরা কখনো কখনো কথিত জনকল্যাণমূলক খাতে কিছুটা ব্যয় করত। পুঁজিতন্ত্রী সমাজেও নানান রাষ্ট্র একান্ত বাধ্য হয়ে গরীবদের বাড়ী, খাদ্য, পরিধেয়, মেডিসিন ইত্যাদি সহ হাল আমলে বেকারভাতা, চিকিৎসাভাতা, শিক্ষাভাতা, শিশু ভাতা, বিয়ে ভাতা, বিধবা ভাতা, উদ্বাস্তু ভাতা সহ লোকসানী খাত, আমদানী খাত ইত্যাকার নানান খাতে

সাবসিডি ও রিলিফ দিয়ে যাচ্ছে এবং সেসব রিলিফ, ভাতা বা সাবসিডি দেওয়ার রাজনৈতিক ক্রেডিট নিচ্ছে শাসকেরা অহরহ তাও বেশরমের মতোই। কিন্তু, রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান সহ সকল সরকারী কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও পারিতোষিক সহ উল্লেখিত সকল খাতের ব্যয়ের যোগান দিচ্ছে বটে পণ্য অতঃপর, পুঁজি উৎপন্নকারী শোষিত মজুর শ্রেণী।

অতঃপর, সিপিআইয়ের বর্ণিত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত মতো যদি সিপিআই ভারতের রাষ্ট ক্ষমতা দখল করতে পারত তবে সিপিআইয়ের সরকার হয়তো ভারতে ভুখা মানুষদের পেট পুরে খাবার দিত। কিন্তু, সেই খাবারের খরচতো দিত বটে পণ্য উৎপন্নকারী মজুরেরাই। অথচ, সকল গরীব বা অনাহারী বা ভুখা মানুষতো পণ্য উৎপন্নকারী মজুর নয় তবে মজুরেরা পুঁজিপতি শ্রেণীর শোষণের কারণেই সাধারণত গরীব। তাই, মজুরদের থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জোরে পুঁজির একটা অংশ নিয়ে তা হতে সিপিআই সরকার সহ ভুখা মানুষদের খাবারের খরচ সহ সরকারী সকল ব্যয় মিটানোর নীতি কি আদৌ মজুর শ্রেণীর স্বার্থের স্বপক্ষে না কি তাতে পুঁজিপতি শ্রেণীর সৃষ্ট কৃত্রিম দারিদ্রতা দুর হবে যাতে কেহ আর ভুখা থাকবে না?

লেনিনবাদী দল- সিপিআইয়ের বর্ণিত রাজনৈতিক সিদ্ধান্তমতো ভুখা থাকাটা হচ্ছে পরাধীনতা অর্থাৎ ভুখাদের স্বাধীনতা নাই । তাহলে, যারা ভুখা নয় তারাতো স্বাধীন! পুঁজিপতি শ্রেণীর অনেকেই সহ উঁচা মজুরীর মজুরেরাওতো ভুখা থাকতে হচ্ছে না বলে উঁচা মজুরীর মজুরেরা সহ পুঁজিপতি শ্রেণীর ধনী অংশতো স্বাধীন। অথচ, ফেরিওয়ালা, হকার, ছোট ছোট দোকানদার, ক্ষুদ্র

শিল্পের মালিক, গৃহপালিত পশু সহ জমির মালিক -কৃষক ইত্যকার নানান বর্গের নানান ব্যক্তি যারা বুর্জোয়া শ্রেণীর ভগ্নাংশ হলেও কার্যত তারাও কখনো কখনো স্বপরিবারেও ভুখা থাকতে হয়। অতঃপর, স্বাধীনতার উল্লেখিত বোধে ও বিবেচনায় বুর্জোয়া শ্রেণীর সদস্য হয়েও তারাও বর্ণিত সিদ্ধান্তমতো স্বাধীন নয় তাই তারাও পরাধীন বটে ভারতে।

উদর ভরা থাকা মানে স্বাধীনতা, স্বাধীনতার এমন সংজ্ঞা দ্বারা স্বাধীনতার মর্ম ও অর্থটাকেই কেবল বিকৃত করা হয়নি বরং স্বাধীনতার আবশ্যকতাও অস্বীকার করছে লেনিনবাদীরা। উল্লেখ্য, আদিম সমাজের মানুষেরাও ভুখা থাকত বা অনাহারে বা খাদ্যাভাবে মারা যেত অনেকেই কিন্তু, তাই বলে আদিম সমাজে কেহ ছিল না কারো অধীন তথা পরাধীন । তাই, স্বাধীনতা শব্দটিরও উৎপত্তি হয়নি আদিম সমাজে। কাজেই, ভুখা থাকা বা পেট পুরে খাওয়ার সাথে স্বাধীনতার কোনো সম্পর্ক নাই। কিন্তু, এখনতো অগণন পণ্যের পুঁজিতন্ত্রী সমাজে কেবল প্রয়োজনের অতিরিক্ত পণ্য থাকাটাও অস্বাভাবিক নয় বরং খাদ্য পণ্যেরও কমতি নাই। তবু, বাজারে খাদ্য পণ্য নাই বলে নয় বরং ক্রয় ক্ষমতা নাই বলে দুনিয়ার প্রায় ৩৭ % মানুষ কম-বেশ দারিদ্রতায় ভোগে আর প্রায় ১০% মানুষ চরম দারিদ্র সীমার নীচে বাস করছে আর প্রায় ৩৫ কোটি মানুষ খাদ্য সংকটে ভোগে বা ক্ষুধার্ত থাকে। তাছাড়া, কৃষিজাত খাদ্যই গ্রহণ করতে হবে এমনতো কোনো কারণ নাই। প্রায় ১৪০ বছর আগেই প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা রাসায়নিক ভাবে খাদ্য সমস্যা সমাধানের নিদান দিয়েছেন। তবে, স্বাধীনতা হীনতায় বা

পরাধীনতায় মানুষ বাঁচে কিন্তু খাদ্য তথা খাদ্য হতে প্রাপ্ত জ্বালানি তথা শক্তি ছাড়াতো মানুষ বাঁচতে পারে না তাহোক কৃষিজাত খাদ্য হতে প্রাপ্ত বা রাসায়নিক শক্তি।

বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য তথা জ্বালানী অর্থাৎ শক্তি আবশ্যক, না হয় মৃত্যু নিশ্চিত। কিন্তু, মানুষ কর্তৃক মানুষের শাসনে তথা পরাধীনতার মধ্যেও মানুষেরা বেঁচে আছে প্রায় সাড়ে ৬ হাজার বছর। এখনো পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যে পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব হয়েছে সাড়ে ৩ শত কোটি বছর আগে। তন্মধ্যে, মানবজাতির বয়স ৬০-৭০ লাখ বছর। কিন্তু শারীরবৃত্তিয়ভাবে (এনাটমিক্যালী) আধুনিক মানুষ তথা হোমোসেপিয়ান্সদের বয়স ২ হতে ৩ লাখ বছর। তন্মধ্যে সাড়ে ৬ হাজার বছর বাদ দিলে খোদ হোমোসেপিয়ানন্স তথা শারীরবৃত্তীয়ভাবে আধুনিক মানুষেরা তথা আদিম সমাজের মানুষেরা বেঁচে ছিল বটে মুক্তভাবে তথা মানব জাতির কেহ ছিল না কারো শাসক তাই, কেহ ছিল না কোনো শাসকের শাসনে বা অধীনে অর্থাৎ কেই ছিল না পরাধীন তথা মানবজাতির কেহ কাউকে বন্দী করেনি বা বন্দীত্বের এখনো বজায় ও বহাল খাকা কোনো শিকলে কেহ শৃংখলিত ছিল না বটে আদিম সমাজে।

প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা ছিল বটে তবু আদিম সমাজের মানুষেরাতো অবাধে গমনাগম করতো পৃথিবীতে যদিও তাদের জানা ছিল না পৃথিবীর আকৃতি, পরিধি, গতি, ভর, আয়তন ইত্যাদি। অর্থাৎ মানুষের চলাচল বা গমনাগমনে মানুষ কর্তৃক কোনো বাধা ছিল না যেমনটা এখন আছে। তাহলে, সব মানুষের পৃথিবীটা কেন কতিপয় মানুষের সম্পত্তি হল ? অথবা,

স্বাধীনতার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে কেন অথবা, মানুষ কেন মানুষের শাসক হল?অথবা,মানুষদেরই একটা অংশ কেন মানুষ কর্তৃক শাসিত তথা শৃংখলিত হল?

অতঃপর, মানুষ কেন ও কখন মানুষের নিকট বন্দী বা শাসিত তথা শৃংখলিত অর্থাৎ পরাধীন হল তা জানা আবশ্যক বটে স্বাধীনতার সঠিক অর্থ বা মর্ম বুঝা এবং সেমতো স্বাধীনতার সংজ্ঞা নির্ণয় ও স্বাধীনতার জন্য কাজ করতে হলেতো তা জানা আবশ্যক।

কিন্তু, অক্ষর আবিষ্কারের বয়ষ এখনো ৫ হাজার বছর হয়নি আর মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে ১৪৩৬ সালে আর আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থাতো চালু করেছে আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের বিকাশ সাধনকারী প্রগতিশীল বুর্জোয়া শ্রেণী । উল্লেখ্য, আদিম সমাজ যা ছিল মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণহীন-শাসনহীন তবে প্রায় বন্য পুশর মতো জীবন-যাপনকারী তবে মনুষ্য প্রজাতির স্বল্প সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে গঠিত একেকটি ছোট ছোট গ্রুপ বা গোষ্ঠী। তাই, আদিম সমাজের মানুষেরা তাদের জীবনাচার সম্পর্কে পরবর্তী প্রজন্মের জানা-বুঝার জন্য সেসবের লিখিত বিবরণ দেওয়ার জন্য ছিল সুযোগহীন । আর সেসবের বিবরণ তথা অতীতের ফাক্টসের ফ্যাক্টশীট তথা ইতিহাস বলে কোনো বস্তু হয় তাও তাদের বোধের মধ্যে থাকার কারণ ছিল না। আদিম সমাজের পরবর্তী - দাস সমাজের প্রতিষ্ঠাকারীরা এবং দাস সমাজের শাসকেরাও অতীতের ঘটনাবলীর সত্য বিবরণ তথা ইতিহাস লিখায় যেমন ছিল সুযোগহীন তেমন ছিল অযোগ্য ও পক্ষপাতদোষে দুষ্ট।

তবে, দাস সমাজের মানবিক পশু- দাসদের দাস হিসাবে দাস মালিকদের সম্পত্তি হিসাবে থাকা ও মালিকের সেবায় জীবনপাত করা সহ দাসমালিকদের সামাজিক অবস্থান ও ভূমিকা নির্ধারণ করে উভয় শ্রেণীর শ্রেণীগত অবস্থান বহাল রাখতে শ্রেণী বিভাজনকে গ্রাহ্যতা এবং শ্রেণী শাসনকে ন্যায্যতা ও বহাল রাখতে বর্বরতার চূড়ান্ত রূপ -মানুষ কর্তৃক মানুষের শাসন তথা দাস মালিকদের রাজনৈতিক সেবক - শাসকদের শাসন ক্ষমতার উৎস, এখতিয়ার ও কার্যাবলীকে ন্যায্যতা ও গ্রাহ্যতা দিতে দাস সমাজের শাসকেরা বানোয়াটি মুলে অনেক অনেক শিশুতোষ গল্প বা কল্পকথা তৈরী করে যা মাইথোলজি হিসাবে গণ্য হয়ে আসছে। তবে, মৌখিকভাবে রচিত ও প্রচলিত মাইথোলজিও লিখিত হয়েছে বটে সেসব রচনাদির সৃষ্টির পরবর্তীতে তাও দাস সমাজের শাসকদের অশুভ ইচ্ছাধীনে ও তাদের হুকুম-নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে এবং বানোয়াটি মূলেতো অবশ্যই তবে অতি অবশ্যই শাসকদেরকে অলৌকিকগুণে গুণান্বিত, মহিমান্বিত,গৌরবান্বিত এবং অসাধারণ হিসাবে গণ্য করে।

অতঃপর, উপরে বর্ণিত প্রশ্নের উত্তর পেতে দাস সমাজের শাসকদের বানোয়াটিমূলে প্রস্তুতকৃত মাইথোলজির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ; সুমেরিয়ান শাসক- **King UrNammu** এর কোড (খ্রীষ্ট্র পূর্ব ২১০০) , ব্যাবিলনের শাসক - **Emperor**

Hummurabi এর কোড (খ্রীষ্ট্রপূর্ব-১৭৫০), প্রাচীন গ্রীসের (ক) ডেকোর কোড (খ্রীষ্ট্রপূর্ব ৬২১) এবং (খ) সোলোনের

সংবিধান (৫৯৪ খ্রীষ্টপূর্ব) রোমান কোড (খ্রীষ্টপূর্ব- ৪৫০) ভারতীয় মাইথোলজির কথিত দুনিয়ার প্রথম মানুষ - মনুর কোড (খ্রীষ্টপূর্ব-১০০) সহ দাস সমাজের অন্যান্য শাসকদের আইন সংহিতা বিবেচনা; বন্য প্রাণী সহ প্রাণীকুলের জীবন যাপন অবলোকন ও এতদ্বিষয়ক তথ্যাদি পর্যালোচনা; ভারতের আন্ধামানের সেন্টিনেলী জনগোষ্ঠী ও আমাজন বন সহ নানান বন-জংগলে এখনো বসবাসকারী আদিম ও প্রায় আদিম মানুষদের জীবনাচারের তুলনামূলক মূল্যায়ন; নৃতত্ত্ব সহ বিজ্ঞানের সংশ্লিষ্ট শাখার এদ্বিষয়ক তত্ত্ব ও তথ্যাদি বিবেচনা; এবং পরিবার, রাষ্ট্র ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব বিষয়ক বৈজ্ঞানিক রচনাদি সহ আদিম সমাজ বিষয়ে অনুসন্ধানী রচনাদি আমলে নিয়ে সেসবের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। পৃথিবীতে তথা জল-স্থলে থাকা সকল প্রজাতির প্রাণীর অনুসন্ধানী কাজের গতি এখনো খুবই ধীর । পৃথিবীতে প্রকৃতিজাত মোট ১০ কোটি প্রজাতির প্রাণী আছে বলে অনুমান করা হয়। তবে ৮৭ লাখ প্রজাতির প্রাণীর অস্তিত্ব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী ও গবেষকেরা মোটামোটি একমত। তন্মধ্যে, মনুষ্য প্রজাতি সহ মোট ৬,৪৯৫ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণীর সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রাণীদের মধ্যে এক প্রজাতির প্রাণী অপরাপর প্রজাতির প্রাণীকে ভক্ষণ করে বেঁচে থাকে বটে কিন্তু, কতিপয় ব্যতিক্রম ছাড়া একই প্রজাতির প্রাণী কেহ কাহাকে ভক্ষণ করে না বরং কোনো প্রজাতির প্রাণী অপর প্রজাতির প্রাণী কর্তৃক আক্রান্ত হলে আক্রান্ত প্রজাতির প্রাণীরা আক্রমণকারী প্রজাতির প্রাণীর বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং স্বপ্রজাতির প্রাণীকে স্বপ্রজাতির প্রাণী শোষণ ও শাসন করে না

বলেই বলা হয়ে থাকে যে কাক কাকের মাংস খায় না। কিন্তু, দাস সমাজেতো বটেই এমনকি হালের আধুনিক পুঁজিতন্ত্রী সমাজের সভ্য প্রজাতির দাবীদার মনুষ্য প্রজাতি? মনুষ্য প্রজাতির একাংশ তথা শোষক-শাসক শ্রেণী এখনো টিকে আছে বটে আরেকাংশকে শোষণ-শাসন করে। যার সূচনা হয়েছিল দাস সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যে সমাজের ভিত্তি ছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

প্রকৃতিজাত মনুষ্য প্রজাতি আদিম অবস্থায় কাটিয়েছে প্রায় ২-৩ লাখ বছর অনেকটা প্রকৃতি নির্ভরতায় তবে খাদ্য সহ জীবন ধারণের উপযোগী প্রাকৃতিক পরিবেশ সন্ধান করেছে অনবরত এবং মোকাবেলাও করেছে প্রকৃতির প্রতিকুল অবস্থাকে। বেঁচে থাকার আবশ্যকীয় শক্তির যোগান এখনো আসে বটে মাছ-মাংস সহ লতা-পাতা ও ফল-ফলাদি হতে। পৃথিবীতে শক্তির মূল উৎস হচ্ছে সূর্য। আদিম সমাজের গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষেরা বন্যাবস্থা হতে উচ্চতর বন্যাবস্থায় পৌঁছার আগে খাদ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণ করতে পারত না যেমন এখনো হাতি, বাঘ ও সিংহ প্রজাতির প্রাণীরা সহ অপরাপর প্রজাতির প্রাণীরা না পারে খাদ্য উৎপাদন করতে, না পারে খাদ্য সংরক্ষণ করতে।

বন্য প্রাণীদের মতোই মনুষ্য প্রজাতির প্রাণীরা ফল-ফলাদি এবং বন্য প্রাণী ও মাছ শিকার ও সংগ্রহ করে সেসব শেকা সহ রান্না শেখার আগতক কাঁচাই ভক্ষণ করত এমনকি মাছমাংসও।শীত-গ্রীষ্ম হতে রেহাই পেতে বা বন্য হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ হতে রক্ষা পেতে আদিম মানুষেরা যেমন তাপানুকল পরিবেশ ও নিরাপদ অঞ্চল অনুসন্ধানে অজানা লক্ষ্যে ও অজানা পথে হেঁটেছে তেমন

খাদ্য তথা মাছ সহ প্রাকৃতিক ফল-মূলের অনুসন্ধানেও স্থানান্তরে গমনাগমন করতে হয়েছে আদিম সমাজের মানুষদেরকে। আফ্রিকার বনাঞ্চল হতে প্রায় ৭০ হাজার বছর আগে মানুষেরা ভারতেও হিজরত করেছে। অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকায়ও হিজরত করেছে মানুষেরা ২০-৩০ হাজার বছর আগে। তবে, তখনকার ভৌগোলিক তথা ভূমি ও সাগরগুলোর অবস্থা ও অবস্থান এখনকার মতো হুবুহু ছিল না। ইউরোপ, চীন, জাপান, ফিলিপিন, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি নামের অঞ্চলগুলোতে আদিম সমাজের মানুষেরা গমনাগম করেছে ৬০-৪০ হাজার বছর আগে।

অনেকের মতে তাপানুকুল পরিবেশ ও খাদ্য প্রাপ্তির জন্য আদিম সমাজের মানুষেরা পাহাড়ী ঢালে ও নদীর নিকটস্ত সমতল ভূমিতে এসে স্থিতু হয়েছিল। ফলে,খাদ্য সংগ্রহের জন্য পশু শিকারের স্থলে পশু পালনের সুযোগ তৈরী হয় আর পশু পালন করতে গিয়ে মানুষ কৃষির সুচনা করে স্থায়ী হওয়ার সুযোগ পায়। এটি বন্যাবস্থার উচ্চতর স্তর বলে চিহ্নিত হয়েছে।

আদিম সমাজের মানুষদের মধ্যে শারিরীক গঠন, রং, সাইজ ইত্যাদি বিষয়ে পার্থক্য ছিল বটে কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো প্রভেদ-বিভাজন, বিরোধ- বিবাদ, সংঘাত ও বৈষম্য ছিল না। অংগ বিশেষের কারণে কেহ হেয়-দুর্বল আর কেহ হালের ক্ষমতাবান পুরুষ নামীয় দাম্ভিক প্রাণী ছিল না। মানুষের কোনো অংগ গোপন বা প্রাইভেট বা লজ্জার অংগ এমন বোধ ছিল না বটে আদিম সমাজের অনাবৃত তথা উদোম শরীরে থাকা মানুষদের।

লতা-পাতাকে পোষাক বা ভূষণ হিসাবে ব্যবহার করেছে তারা শীতের প্রকোপ হতে সুরক্ষা পেতে তাও বেশ দেরীতে। সেন্টিনেলী জনগোষ্ঠী সহ এখনো বেশ কিছু নিরাবরণ তথা পোষাকহীন মানুষ আছে বটে দুনিয়ার নানান বনাঞ্চলে। তাই, লিংগ ভিত্তিক কোনো পরিচয় বা বিভাজন বা বিভক্তি বা প্রভেদ বা বৈষম্য ছিল না আদিম সমাজে। গর্তে বা বাসা বেঁধে কোনো কোনো প্রাণী বাস করলেও মানুষ ছাড়া আর কোনো প্রাণী এখনো কোনো পোষাক পরিধান করে না। তাই, শরীরের কোনো অংগ গোপন বা লজ্জার এমন বোধও প্রাণী জগতে মানুষ ছাড়া আর কারো নাই কিন্তু কেন? এমনকি, মানব জাতিকে বিভক্তকারী শোষক-শাসকেরা প্রজনন অংগ হিসাবে যে অংগকে চিহ্নিত করে সেসব অংগের অন্যান্য ক্রিয়াদিকে অবিবেচনায় নিয়ে সেসব অংগের কার্যত ভুল নামাকরণ করে সেই সকল অংগাদির একটি মাত্র ক্রিয়াকে প্রজনন ক্রিয়া বলে সাব্যস্ত করে প্রজনন বিষয়টিকে যেমন গোপন একটি ক্রিয়া বলে চিহ্নিত করছে সেই রকম বোধ কিন্তু আর অন্য কোনো প্রাণীর নাই।

আদিম সমাজের মানুষেরা নিরাবরণ থাকত বলে শাসকদের কথিত যৌন অংগাদি তারা প্রত্যেকেই দেখতো কিন্তু তাতে সারাক্ষণ তাদের কাম ইচ্ছা জাগ্রত হত তেমনটা ছিল না। এখনো মানুষ ছাড়া অন্তঃত ৮৭ লাখ প্রাণীর কথিত যৌন অংগাদি তারা দেখে থাকে সারাক্ষণ কিন্তু সারাক্ষণতো নয়ই বরং কোনো কোনো প্রাণী বছরে মাত্র একবার যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত হয়। আসলে, প্রস্রাব করার চেয়েও কম গুরুত্বপূর্ণ তবে দরকারী

একটি শারীরবৃত্তীয় স্বাভাবিক ক্রিয়া- কাম ক্রিয়া করে থাকে কেবল মানুষ নয় বরং প্রাণীকুলের অপরাপর প্রাণীরা।

অথচ, দাস সমাজের শাসকেরা লৈংগিক রাজনীতি চালু ও বহাল রাখতে গিয়ে বলল যে নারীদের যৌনাংগতো বটেই এমনকি তাদের উন্মুক্ত তথা অনাবৃত মুখমন্ডলও যদি কোনো পুরুষ দেখে তবে নাকি সেই পুরষটি তখনই কামুক হয়ে উঠবে। তাইতো পুরুষকে অবৈধ ও অসংগত কামোত্তেজনা ও বেআইনী কাম হতে রক্ষা করতে নারী কেবল মহলবন্দী জীবনযাপন করলেই হবে না বরং নির্দিষ্ট সংখ্যক পুরুষ ব্যতিত আর কোনো পুরুষ যাতে তাদের উন্মুক্ত চেহেরা না দেখে তার বিহীত করা সমেত নারীদের এমনকি পোষাক পরিধানের বিষয়েও শাসকেরা নানান নিয়ম-নীতি এবং বিধি-নিষেধ জারী করেছে। শরীরবৃত্তিয় ক্রিয়াদির একটি গুরুত্বপূর্ণ তথা সেক্সুয়াল ক্রিয়াকলাপ যে হরমোনাল ক্রিয়া তা জানতে সুযোগহীন দাস সমাজের শাসকেরা তাদের বদমতলবে কেবল নারী নয় বরং পুরুষকেও তাদের ভূয়া রাজনৈতিক বোধে আচ্ছন্ন ও বিভ্রান্তকরণে নারীর সমগ্র শরীরকে কেবলই সম্ভোগ সামগ্রী হিসাবে সাব্যস্ত ও চিহ্নিত করে পুরুষদেরকে কামোন্মাদ জন্তু হিসবে শনাক্ত করেছে তাতে তাদের শাসনাধীন কালের নারী-পুরষ সকলকে সম্পূর্ণত অন্যায়, অযৌক্তিক ও উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে আদিম সমাজের মানুষদের অপেক্ষা নিম্নস্তরের মানুষ হিসাবেই কেবল সাব্যস্ত করেনি বরং অপরাপর প্রাণীদের তুলনায় নীচে নামিয়ে কার্যত মানব প্রজাতিকে ভয়ানকভাবে অসন্মান ও অমর্যাদা করেছে। প্রকৃতপক্ষে, নারী নয় যৌন সামগ্রী আর পুরুষ নয় কামোন্মাদ

বরং প্রত্যেকেই মানুষ। নারী বা পুরুষ বা হিজড়া সেতো কেবলই শাসকদের
স্বার্থে সৃষ্ট রাজনৈতিক বোধে একটি রাজনৈতিক পরিচয় মাত্র।

মানব জাতির অস্থিত্বের শর্তাদির প্রথমটি- রিপ্রোডাক্টশন , এই বিষয়েও আদিম সমাজে ছিল না হাল আমলের মতো রহস্যময়তা ও গোপনীয়তা । আদিম সমাজে একই গোষ্ঠীর সকলে একত্রে বসবাস করত । তন্মধ্যে শিশু ও রোগাক্রান্ত বা বৃদ্ধ ও কর্মে অক্ষমরা ব্যতিত গোষ্ঠীর বাকী সকলেই খাদ্য সংগ্রহে শিকার ও ফল-ফলাদি আহরণে সম্মিলিতভাবে কাজ করত। খাদ্যাভাবে হয়তো কখনো কখনো কোথাও কোথাও একই প্রজাতির বা গোষ্ঠীর কর্মে অক্ষমদের ভক্ষণ করেছিল কেহ কেহ কিন্তু, সাধারণভাবে আদিম সমাজের মানুষদের নিজেদের মধ্যে হিংস্রতা ছিল না। সহযোগীতা বৈ প্রতিযোগীতা ছিল না তাদের মধ্যে। পরিবার ও বিয়ে ব্যবস্থা ছিল না আদিম সমাজের মানুষদের মধ্যে যেমন মনুষ্য প্রজাতি ছাড়া আর অন্য কোনো প্রজাতির মধ্যে এখনো বিয়ে বা পরিবার প্রথা নাই।

প্রাকৃতিক নিয়মেই আদিম সমাজের শিশুরা জন্ম নিত ও বড় হতো এবং ভবিষ্যতে না হলেও এখনো যেমন মনুষ্য শিশুরা জন্ম নেয় ও বড় হয়ে থাকে। শিশুদের এডাল্ট হতে একটি হরমোন দায়ী যাকে এখনো খুবই অসম্পূর্ণভাবে বা খন্ডিতভাবে এবং সংকীর্ণ অর্থে সেক্স হরমোন বলা হচ্ছে। বিবৃত হরমোনের কারণেই প্রায় সকল প্রজাতির শিশু শারিরীকভাবে যেমন বলবান ও পরিপক্ক হয় তেমন সেক্স করার যোগ্য হয়। ভবিষ্যতে প্রয়োজন না হলেও এখনো সেক্সের ফলে

নবজাতকের জন্ম হয়। আদিম সমাজের মানুষেরা সেক্সের ক্ষেত্রেও ছিল অবাধ তথা কে কার সাথে সেক্স করবে বা করবে না তা নির্ধারণ করার কোনো কর্তৃত্ব বা কর্তৃপক্ষ তখন ছিল না এবং দাস সমাজের আগে তেমন কর্তৃপক্ষ গঠিত হওয়ার কোনো কারণও ছিল না। ফলে অবাধ যৌন সম্পর্ক ছিল আদিম সমাজের মানুষদের মধ্যে। এখন যেমন সমকাম উভকাম ইত্যকার শব্দ বিদ্যমান তখন অর্থাৎ আদিম সমাজে এরকম সম্পর্কগুলো ছিল বটে কিন্তু এসব টার্ম ছিল না। কারণ, হোমোসেপিয়ান্সরা ভাষা ব্যবহারে সমর্থ হয়েছে মাত্র ৫০ হাজার বছর আগে এবং এখনো চালু তবে ক্ষীয়মান বা ক্রমাগত বিলুপ্ত হচ্ছে এমন বেশ কিছুর ভাষায় শব্দ সংখ্যা খুবই কম। তবে, এখনো ব্যবহৃত হয় বা চালু আছে পৃথিবীর এমন পুরোনো ভাষা হচ্ছে তামিল ও মিশরীয়। উল্লেখ্য, প্রাণী কুলে অনেক প্রাণী আছে যেগুলো কেবল সম বা উভকামীই নয় বরং স্বকামী অর্থাৎ তাদের দেহে নারী ও পুরুষ হিসেবে পরিচিত দুটো অঙ্গই আছে। অতঃপর, সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানাহীন আদিম সমাজে কেহ ছিল না কারো অধীন তথা পরাধীন তাই, স্বাধীনতার বোধ তথা মানুষ কর্তৃক মানুষের শাসন হতে মুক্তি লাভের বোধও আদিম সমাজে জন্ম নেওয়ার কারণ ঘটেনি।

মনুষ্য প্রজাতির উচ্চতর বন্যাবস্থা হতে দাস সমাজের পত্তন হয়েছে পৃথিবীর এমন ৭ টি অঞ্চল যাতে দাসমালিকদের স্বার্থ সংরক্ষণে জমির বন্টন, জল সিঞ্চন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিরাপত্তা সাধন, বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ, অভিভাবকত্ব ও উত্তরাধিকার নিশ্চিতকরণ, দাসপ্রভুদের পরজীবিতার

নিশ্চয়তা বিধানে সামাজিক শৃংখলা ও শান্তি নিশ্চিতকরণ এবং বহিরাগতদের হামলা-আক্রমণ হতে রাজার স্বীয় রাজ্য তথা রাষ্ট্রকে নিরাপদ রাখতে সেনাবাহিনী সমেত সরকার তথা বর্ণিত বিষয়াদির একটি সাধারণ ব্যবস্থাপনা সংস্থা সমেত গঠিত পৃথিবীর সবচইতে পুরোনো ৭ টি দাসতান্ত্রিক রাষ্ট্র হচ্ছে-

(১)সুমার (প্রাচীন মেসোপোটামিয়া, ট্রাইগ্রীস ও ইউপ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী স্থান হালের ইরাক, সিরিয়া, কুয়েত, তুরস্ক ইতাদি) খ্রষ্ট্রপূর্ব ৪৫০০।পরবর্তীতে সার্জন আক্কাডিয়ান ষ্টেট বলে গণ্য। খ্রীষ্টপূর্ব-২৩৩৪-২২৭৯।

(২) হরোপ্পান (ইন্ডাসভেলি, হালে পাকিস্তান) খ্রীষ্টপূর্ব-৩৩৫০।

(৩)প্রাচীন মিশর, খ্রীষ্টপূর্ব-৩০৫০।

(৪) চীন, খ্রীষ্ট্রপূর্ব- ২০৭০।

(৫) প্রাচীন গ্রীস, খ্রীষ্টপূর্ব-১১০০।

(৬) প্রাচীন রোম, খ্রীষ্টপূর্ব-৭৫৩। (৭) জাপান, খ্রীষ্টপূর্ব-৬৬০।

হরোপ্পা রাষ্ট্রটি কেন এবং কারা প্রতিষ্ঠা করেছিল সেই সম্পর্কে তেমন কোনো রেকর্ড পাওয়া যায়নি। কিন্তু, বাকী ৬ টি দাসতন্ত্রী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে সব বিবরণ পাওয়া যায় তাতে এটা নিশ্চিত যে দুটো পক্ষের সংঘাত তথা যুদ্ধের পরিণতিতে রাষ্ট্রগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিজয়ীপক্ষ দ্বারা। চীন ও রোম ছাড়া বাকী ৪ টি দাসতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটেলার ও নন-সেটেলারদের মধ্যে যুদ্ধের ফলে। আর চীন ও রোমেও প্রায় একই রকম ঘটনা ঘটলেও সংঘাতকারী পক্ষদ্বয় একই ট্রাইবের

বলে রোমান মাইথোলজী ও চীনা লোককথার বিবরণে বুঝা যায়। তাছাড়া, ভারতেও দাস সমাজ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল একই ট্রাইবের মধ্যকার যুদ্ধ এবং ভিন্ন ভিন্ন ট্রাইব গুলোর যুদ্ধের মাধ্যমে মর্মে প্রতীয়মান হয় রাম-রাবনের যুদ্ধ ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পৌরাণিক কাহিনী হতে।

তুলনামূলকভাবে অনুকুল তাপ ও খাদ্যের সন্ধানে আদিম যুগের বন্য মানুষেরা তৎপর ছিল। কিন্তু, বন্যাবস্থার সর্বোচ্চস্তরে কোনো একটি গ্রুপ যখন কোনো অঞ্চলে কৃষি সহ বসতি স্থাপন করেছে তখন গোষ্ঠী মালিকানার সূত্রপাত ঘটে। গোষ্ঠীগত সম্পত্তির কারণে আগের মতো একটা গ্রুপে থাকার সুযোগ কমে গিয়ে একটি এলাকাব্যাপী ট্রাইবাল বসতি গড়ে উঠে। একই ট্রাইবের লোকদের মধ্যে গোষ্ঠীগত মালিকানার সম্পত্তিতে উৎপাদন ও উৎপাদিত সামগ্রী বিলি-বন্টন এবং এই বিলি-বন্টনে কিছু নীতি যা সকলের মতামতে গৃহীত হয়েছিল তাতে কোনো সমস্যা দেখা দিলে তা সকলের মতামত নিয়ে সমাধানে উদ্যোগী হতে শুরুতে সমাজের কাউকে দায়িত্ব দিতে হয়েছিল যাতে সূত্রপাত হয়েছিল ভবিষ্যতের রাজনৈতিক ক্ষমতার। গোষ্ঠীগত মালিকানায় কৃষি উৎপাদন ও বন্টন বিষয়ে কোনো ধরণের বিবাদ দেখা দিলে তা যদি নিস্পত্তি না হয়ে থাকে তবেতো বিরোধীয় পক্ষের মধ্যে সংঘাত বা যুদ্ধ হওয়াটাও অসম্ভব ছিল না। চীনের ক্ষেত্রে তেমনটাই হয়েছে বলে ধারণা করা যায় , রোমেও অনেকটা তাই। তবে রোমের প্রতিষ্ঠাতা- রোমান মাইথোলজির যুদ্ধ দেবতা- মার্স কর্তৃক ধর্ষিত কুমারী রেহা সিলভার গর্ভজাত পুত্রদ্বয় তথা রোমুলাস ভাতৃদ্বয় তখনকার

ট্রাইবাল চীফ তথা তাদের মায়ের বাবা- নুমিটরের হত্যাকারী অর্থাৎ নুমিটরের ভাই -এমুলিয়াসকে হত্যা করে নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অর্জন করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং সাবিয়ান্স সহ অপরাপর ট্রাইবকে চালাকি, ধূর্ত্যামি ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের মাধ্যমে পরাজিত ও পরাভূত করেই রোমের অধিভুক্ত করেছে।

কিন্তু, সুমার, জাপান ইত্যকার রাষ্ট্রগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এসব অঞ্চলে পূর্বে আসা ও বসতি স্থাপনকারী সেটেলারদের সাথে একই অঞ্চলে একই কারণে পরে আসা তথা নবাগতদের বিরোধ ও যুদ্ধের কারণে।

কেবল বসতি হারানো বা বসতি দখল করা নয় বরং সেটেলার আর নবাগতরা একই প্রজাতির মানুষ হলেও তারা কিন্তু কেহ - কাউকে চিনা বা জানার সুযোগ ছিল না এমনকি উভয় গোত্রের মানুষদের ভাষাওতো ছিল পরস্পরের নিকট অজানা। তাই, উভয় পক্ষ উভয়পক্ষকে নিজেদের জীবনের জন্য হুমকি বা ক্ষতিকর বিবেচনা করাটাই ছিল স্বাভাবিক। পূর্বে যারা বসতি স্থাপন করেছিল তাদের সকলের খাদ্য সহ বেঁচে থাকার জন্য তখনকার সময়ের আবশ্যকীয় সামগ্রীতো থাকা বা উৎপাদন বা সংরক্ষণ করার সুযোগ বা ব্যবস্থাতো ছিল না বটে কোনো স্থানের সেটেলারদের।

কিন্তু, সেই একই স্থানে নবাগত তথা বহিরাগতরা বসতি গাড়লে তখনকার গোষ্ঠীগত সীমিত সম্পত্তিতে সকলের খাবার সহ বেঁচে থাকার অপরাপর বিষয়গুলোর সংস্থান না হওয়ার আশংকা হওয়াইটা ছিল স্বাভাবিক। যেমন এখনো,ইটালী, ফ্রান্স,

সুইডেন, আমেরিকা সহ ধনবান রাষ্ট্রগুলোতে অভিবাসীদের তাড়ানোর জন্য রাজনৈতিক হিংস্রতার প্রকাশ ঘটাচ্ছে বটে আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সহ নানান রাজনীতিকেরা। তখন, নবাগতরাও পূর্বের সেটেলারদের কারণে এমনকি একই স্থানে বসত করার সুযোগ পাবে কি না তাওতো জানত না। তাইতো উভয়পক্ষ উভয় পক্ষকে নিজেদের জীবন নাশের কারণ ভেবে নিজেদের অজ্ঞাতে বা কেহ কাউকে পূর্বপরিকল্পিতভাবে শত্রু গণ্য না করেও বা কোনো বীর বিশেষের মস্তিষ্ক প্রসূত কোনো মহাপরিকল্পনা দ্বারা নয় বরং উদ্ভূত পরিস্থিতিতে একে অপরকে শত্রু সাব্যস্ত করে দ্বন্দ্ব-সংঘাত তথা যুদ্ধে লিপ্ত হওয়াটা ছিল স্বাভাবিক। তাইতো উভয়পক্ষ নিজ নিজ অস্থিত্ব রক্ষার জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল যেমনটা তারা অপরাপর বন্য হিংস্রপ্রাণী হতে বেঁচে থাকার জন্য লিপ্ত হত।

সুমার বা মিশর বা জাপান ছাড়াও পৃথিবীর যেসব স্থানে দাসতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেসব স্থানেও অনুরূপ যুদ্ধ হয়েছিল বলে কম-বেশ জানা যায় গ্রীস , ভারত সহ নানান দেশের মাইথোলজিতে। অতঃপর, এরকম যুদ্ধে যারাই বিজয়ী হয়েছে তারাই পরাজিতদেরকে নিজেদের অধীনস্ত করে অধীনস্তদেরকে দাস তথা মানবিক পশু বানিয়ে গৃহপালিত পশুর মতো সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করে দাস সমাজের পত্তন করেছে।

এমনকি, আধুনিক শিল্পের উৎস ভূমি আধুনিক বৃটেনের কথিত সভ্য পুঁজিপতিরাওতো তাদের দখলীকৃত আমেরকিায়

স্থানীয়দেরকে দাস বানিয়েছে। বৃটেনের পুঁজিপতি শ্রেণী আমেরিকাকে দখল করে কলোনি তৈরী করলেও বৃটেনে বসবাসকারী ও আমেরিকায় বসবাকারী পুঁজিপতিদের মধ্যকার পুঁজিতান্ত্রিক প্রতিযোগীতা, বিরোধ ও বৈরীতার কারণে স্বশ্রেণীর মধ্যকার যুদ্ধের মাধ্যমে বৃটেনের পুঁজিপতিদের পরাজিত করে আমেরিকার পুঁজিপতিরা আমেরিকাকে বৃটেন হতে আলাদা করে আমেরিকায় একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। নব প্রতিষ্ঠিত আমেরিকা রাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন আমেরিকার দাসদেরকে দাস হিসাবে রেখে দেওয়ার জন্য ব্যাবিলনের বর্বর সম্রাট হাম্মুরাবির আদলে পলাতক দাসদের পলায়নরোধে আইন করেছিলেন এবং ব্যক্তিগতভাবে তিনি আমেরকিার প্রচলিত আইনকে ফাঁকি দিয়ে তার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত দাসদেরকে প্রেসিডেন্টের হাউসে রেখেছিলেন। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পর ১৮৬৫ সালের আইনে আমেরিকায় দাস প্রথা নিষিদ্ধ হয়। পরাজিত গোত্রের অচেনা-অজানা আবার যুদ্ধে প্রাণ না হারানো তবে আহত বা অক্ষত মানুষদের বিজয়ী পক্ষের অধীনস্ত করা বৈ মুক্ত রাখার প্রশ্ন ছিল না। অথবা, একদা মুক্ত কিন্তু হালে যুদ্ধে স্বজন হারানো আবার যুদ্ধেও পরাজিতদেরকে বন্দী তথা অধীনস্ত করা ছাড়া কোনো বিকল্পও ছিল না বিজয়ী পক্ষের। কিন্তু, কাউকে বন্দী রাখতে হলে বন্দীদেরকে দমন-পীড়ন করে অনুগত বা বাধ্যগত রাখতে প্রয়োজন হয়ে পড়ে দমন-পীড়নে উপযুক্ত কোনো সংগঠন বা সংস্থার আর সেই সংস্থাকে পরিচালনা করতে একটি উপযুক্ত কর্তৃত্ব।

অতঃপর, পরাজিত ব্যক্তিদেরকে বন্দী বা অধীন করার মাধ্যমে তাদেরকে বিজয়ীদের সম্পত্তি গণ্যে এতোদিনকার মানুষ পরিচয় মুছে দিয়ে পরাজিতদেরকে মানবিক পশু- দাস সাব্যস্তে বিজয়ীরা দাসদের মালিক তথা শাসক শ্রেণী হিসাবে পরিগণিত হল। আর শাসনে মানে দমনপীড়নের উপযুক্ত শক্তি রাষ্ট্র তখনই গঠিত হল আর রাষ্ট্র পরিচালানায় সৃষ্টি করা হল রাজা বা সম্রাট পদ-পদবীর শাসকদের। সুতরাং, দাস সমাজ যেমন কোনো মহাশক্তিধর ব্যক্তির প্রতিষ্ঠিত নয় তেমন দাসতান্ত্রিক রাষ্ট্র কোনো মহাবীরের চিন্তাপ্রসুত সৃষ্টি নয় যেমনটা লোককাহিনী বা পৌরাণিক কাহিনী বা মাইথোলজিতে বিবৃত হয়েছে।

যৌক্তিক নয় তবু অসাম্যের দাস সমাজ ছিল এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা। দাসকে সম্পত্তি গণ্যে দাসদেরকে ব্যবহার করে কৃষি উৎপাদন সহ যুদ্ধ করা পর্যন্ত সব কাজেই খাটাত বটে দাস মালিক তথা দাস সমাজের শোষক-শাসক শ্রেণী তথা দাস মালিক শ্রেণী। অতঃপর, দাস সমাজে দাসেরা ছিল শোষিত আর দাস মালিকেরা ছিল শোষক। *হোক না মানুষ কিন্তু দাস সমাজের মানবিক পশু- দাসেরা যখন সম্পত্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে তখন ইতিহাসে এই প্রথম ব্যক্তিগত সম্পত্তির সূচনা হল।* আবার ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানার ভিত্তিতে মানুষ মানুষকে শোষণ করার সুযোগ পেল। ফলে, মানব প্রজাতি বিভক্ত হয়ে স্বীয় মনুষ্য পরিচয় হারিয়ে পরিণত হল দাস ও দাস মালিক শ্রেণীতে মানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে শ্রেণীর উদ্ভব হল। আর শোষক-শাসক শ্রেণীর শোষণমূলক তথা পরাজীবিতার স্বার্থে জন্ম নিল রাষ্ট্র, রাজনীতি ও রাজার। ফলে, মানুষ মানুষের নিকট বন্দী

তথা পরাধীন হল দাস সমাজেই প্রথম। তাই, পরাজিতদেরকে দাস তথা বিজয়ীদের সম্পত্তি গণ্য করে যুদ্ধে প্রাপ্ত মালামাল তথা গণিমাতে মাল যুদ্ধ জয়ীদের মধ্যে ভাগা-ভাগির নিয়ম-নীতি তৈরী করতে হয়। যুদ্ধে পরাজিতদেরকে গণিমাতে মাল সাব্যস্ত করা হত। গণিমাতের মাল ভাগা-ভাগি করা সহ দলখীকৃত অঞ্চলে জমি-জমা বন্টন, দাসদেরকে দাস হিসাবে বংশপরম্পরায় দাস হিসাবে রেখে দেওয়ার বিহীতাদিকরণে রাজার ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পন্নকরণে রাজার সহযোগী সহ গৃহস্থালীর কাজ ও সমরাস্ত্র তৈরীর কাজে দাস সমাজে সূচিত হল নানান পেশা আর পেশাভিত্তিক সামাজিক বর্গ। তাতে দাস ও দাস মালিক শ্রেণী ছাড়াও মুক্ত মানুষ নামে একটা বর্গ ছিল তবে তারাও ছিল রাজাজ্ঞাধীন। তাই, প্রকৃতার্থে দাসতন্ত্রে কেহই ছিল না মুক্ত বা স্বাধীন। রাজা ছিলন শাসক কিন্তু তিনি নিজেকে মহাক্ষমতাধর প্রমাণে নিজের রাজকীয় কার্যকলাপে কিছু নিয়ম-বিধি, প্রথা-রীতি ইত্যাদি তৈরী করেছেন। অতঃপর, খোদ রাজাই ছিল বটে রাজকীয় নিয়ম-নীতি ও ঐতিহ্যের অধীন তথা পরাধীন।

দাসেরাতো নিজেরাই ছিল দাস মালিকদের সম্পত্তি। তাই, দাসেরা জমি-জমা বা কোনো সম্পত্তির মালিক ছিল না বিধায় দাস সমাজেই দাসেরা ছিল সম্পত্তিহীন এক শোষিত শ্রেণী।

জমি সহ প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট নানান সম্পত্তি যা কোনো রাজ্যের অধীন হত তা হয়ে যেত রাজার সম্পত্তি। প্রাকৃতিক সম্পত্তিকে ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি গণ্যে ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠা করার ম্যাধ্যমে প্রকৃতিকে অবাধে ব্যবহার করার সুযোগ হতে প্রকৃতি

সৃষ্ট মানুষকেও বঞ্চিত করাটা ছিল চরম অন্যায় । তাইতো, ব্যক্তিগত মালিকানা শোষক-শাসকদের আইনে বৈধ হলেও কার্যত ইহা হচ্ছে অন্যায়, অযৌক্তিক ও অন্যায্য একটি বিষয়।

কিংডমের সম্পত্তির মালিক - রাজা নিজে তার কিংডমের জমি সহ ইত্যকার সম্পত্তি রাজ্য বাসীর মধ্যে বিলি-বন্টন করে দিতেন অথবা রাজার প্রতিনিধিরাও রাজকীয় ক্ষমতায় বর্ণিত কাজটি করতেন। অথচ, কোনো রাজা-বাদশার বাপ-দাদা কেহই জমি সহ প্রাকৃতিক কোনো সম্পদ তৈরী করেনি কিন্তু নিজের রাজ্যের জমি সহ প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা দখল করে প্রজাদের মধ্যে তা বিলি-বন্টন করে দাসসহ যাদেরকে নিজেদের জন্য এমনকি ভূমি ব্যাবহারের সুযোগ রহিত করলেন তা যে প্রাকৃতিক নিয়মের পরিপন্থী তাতেতো কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। অতঃপর, দাসতন্ত্র তার যাত্রা শুরু করেছে অন্যায়, অযৌক্তিক ও অন্যায্য ব্যক্তিমালিকানার ভিত্তিতে তবে, মানুষ মানুষকে শোষণ করার নীতিতে বিধায় শোষণের নিমিত্তে মানুষ মানুষকে শাসন করার মাধ্যমে মানুষ মানুষকে পরাধীন করে।

অতঃপর, *ব্যক্তিগত সম্পত্তিবানদের স্বার্থে সৃষ্ট বহু শিকলের একটা বড় বান্ডিল-রাষ্ট্র তৈরী ও বহাল রাখার মাধ্যমে রাজা বা রাজকীয় কর্তৃত্ব বা কর্তৃত্বের যাবতীয় হুকুম-নির্দেশ তথা শাসনে রাজার ক্ষমতার উৎস সহ ক্ষমতার এখতিয়ার, ব্যাপ্তি ও কার্যাবলী বিষয়ে বানোয়াটি মূলে যে বিবৃতি দিয়েছিল রাজারা তা হচ্ছে রাজনীতি।*

অথচ, এসকল হুকুম-নির্দেশ বা শোষণ-শাসন সবই হচ্ছে কার্যত অন্যায় ও অন্যায্য কর্ম তাই দুস্কর্ম। আর, দুস্কর্মকে রক্ষা ও সংরক্ষার জন্য ক্রিয়াদিও দুস্কর্মতো বটেই। যদিচ, শাসকদের বানোয়াটি রাজনৈতিক বোধে তাদের দুস্কর্মকে যারা অমান্য করে তারা হচ্ছে দুস্কর্মকারী। কিন্তু, যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না তখনতো রাজা-বাদশা ছিল না। অতঃপর, রাজা বিহীন তথা শাসক বিহীন কালে না ছিল রাজাদের তথা শাসকদের পরজীবিতার দুস্কর্ম এবং না ছিল শাসকদের বোধে বা আইনে সংঘটিত কোনো দুস্কর্ম। আসলে, বিদ্যমান সকল দুস্কর্মের কারণ বটে ব্যক্তিগত সম্পত্তি। আর ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে গ্রাহ্যতা দিতে ও ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে রক্ষা ও সংরক্ষা দিতে গঠিত রাজ্যে রাজার ক্ষমতা, এখতিয়ার ও ক্ষমতার উৎস বিষয়ে প্রণীত বিবৃতি যেহেতু রাজনীতি সেহেতু, *সকল দুস্কর্মের নীতিসমূহের মধ্যে রাজনীতি হচ্ছে শীর্ষ নীতি। কার্যত, রাষ্ট্র ও রাজা দুটোই শোষকদের বানোয়াটি তবে রাজনৈতিক তথা কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান।*

শোষক-শাসকদের জন্য আবশ্যক হলেও রাষ্ট্র জন্ম নিয়েছিল কিন্তু শোষিত ও শাসিতদেরকে শাসন তথা দমন-পীড়ন ও ক্ষমতাহীন রাখতে। তাতে, রাজাজ্ঞা অমান্যে মৃত্যুদন্ড প্রদান করা এবং দন্ডপ্রাপ্তকে মার্জনা করার এখতিয়ারও নিয়ে নিলেন রাজা। ফলে, যে কারো জীবন ও মরণ দুটোই নির্ভর করত রাজা তথা শাসকের উপর । আর রাজার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা নির্ভর করত রাজার অধীন রাজ্যে রাজকীয় ক্ষমতা রক্ষা করা সহ রাজ্যের সম্পত্তিবানদের সম্পত্তি সুরক্ষার জন্য আবশ্যকীয় শর্তাদির উপর। দৃশ্যত, রাজা যখন যা ইচ্ছা তা করতেন বা করতেন না

কিন্তু বস্তুত, রাজারাও ছিলেন বটে তাদের সময়কালের বিদ্যমান সামাজিক অবস্থা ও শর্তাদির অধীন। তাই, *চরম কর্তৃত্ববাদী ও স্বেচ্ছাচারী রাজারাও ছিল বটে সামাজিক অবস্থার বিদ্যমান শর্তাধীন অর্থাৎ পরাধীন।*

প্রকৃতির সুযোগ-সুবিধা নিয়ে স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকা প্রত্যেকের প্রাকৃতিক অধিকার। কিন্তু চরম কর্তৃত্বমূলক প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের একচ্ছত্র অধিপতি- রাজা মানুষের বেঁচে থাকার প্রাকৃতিক অধিকারকে যেমন হরণ ও অস্বীকার করল তেমন পৃথিবীতে মুক্তভাবে চলা-ফেরার অধিকারকেও অস্বীকার ও নিষিদ্ধ করল। একজন রাজা যিনি নিজেই মনুষ্য প্রজাতির একজন তিনি কি করে এমন ক্ষমতাবান সেসবের বিবরণ তথা রাজনৈতিক বিবৃতিতে রাজাদেরকে অলৌকিক ক্ষমতাবলে ভয়ানক বলীয়ান হিসাবে উপস্থাপন করতে গিয়ে মনুষ্য সমাজে ডিভাইন পাওয়ার ও ডিভাইন রাইটের ভুয়া ধারণার জন্ম দেওয় হয়। প্রজননের মাধ্যমে জন্ম নেওয়া মানবজাতির প্রত্যেকেই ২৩ জোড়া ক্রোমোজম হতে সৃষ্ট তাই প্রত্যেকেই জন্মগত উপাদানে সমান এবং চিন্তা করার মতো একটি মস্তিষ্ক প্রত্যেক মানুষেরই আছে। অতঃপর, মস্তিষ্কের ক্রিয়া- চিন্তা সংঘটনে অনূন্য ১০০০ কোটি নিউরন কোষ সহ আরো কিছু কোষ বৈ মেধা নামক কোনো বস্তু মস্তিষ্কে নাই।

কিন্তু, দাস সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও শাসকেরা নিজেদেরকে ডিভাইন রাইটহোল্ডার দাবী করে বলতো যে তারা ডিভাইন রাইটহোল্ডার বলেই তারা হচ্ছে এভার টেলেন্টেড, একস্ট্রা অডিনারী এবং গ্রেট গ্রেট এন্ড দা গ্রেট। আর, বাকীরা হচ্ছে

বেকুপ, গর্দভ, মেধাহীন, অর্ডিনারী ইত্যাদি ইত্যাদি । তাই, কথিত এভার টেলেন্টেড ও একস্ট্রা অডিনারীরা দেখ-ভাল করছে বলেই বেঁচে-বর্তে থাকার সুযোগ -সুবিধা পেয়েছে বটে কথিত অর্ডিনারী মানুষেরা। এরকম সব মিথ্যাচার করতে গিয়ে কার্যত পৃথিবীর জন্মতো নয়ই এমনকি পৃথিবীর আকার, আকৃতি, আয়তন বা ভর-ওজন সম্পর্কে একদম অজ্ঞ বা জানার সুযোগহীন তবে দাস সমাজের ধূর্ত্য রাজনীতিকরা কথিত "ত্রিভুবন" এর সৃষ্টি, পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব, মানুষ্য প্রজাতির উদ্ভব ইত্যকার বিষয়ে না জেনে এমনকি এনাটমি বিষয়েও সম্পূর্ণত অজ্ঞ হয়েও যে রাজনৈতিক বিবৃতি দিয়েছিল তাহাই পরবর্তীতে লিখিতরূপে প্রকাশিত হয় যা পৌরাণিক কাহানী বা মাইথোলজি হিসাবে প্রচলিত। অথচ, দাসোচিতবোধে আচ্ছন্নরা এসব পৌরাণিক কাহানী তথা শিশুতোষ গল্পকে ইতিহাস হিসাবে এখনো জাহির করে বা মান্য করে।

প্রাচীন মেসোপোটামিয়ার প্রথম সম্রাট সার্জন আক্কাদ(খ্রীষ্টপূর্ব ২৩৩৪) এর জন্মবৃত্তান্ত তৈরী করতে বিবৃত হয়েছে যে তার কোনো পিতা ছিল না তবে তার মা ছিল দেবী। রোমের রোমুলেসারাও রোমান মাইথোলজি মতে যুদ্ধদেবতার ধর্ষণজাত সন্তান যাদেরকে লালনপালন করেছে বনের এক বাঘিনী। সম্ভবত, রোমুলেসদের বাঘের মতো হিংস্রতায় মায়ের চাচাকে হত্যা করা সহ অপরাপর ট্রাইবের লোকজনকে হত্যা করার সক্ষমতাকে গ্রাহ্যতা দিতে এমন গল্প তৈরী করা হয়েছে। গ্রীক দেবী এথেনার নাকি জন্ম হয়েছে তাও আবার পরিপূর্ণ যুবতী রূপে তার পিতার মস্তিষ্কের সামনের অংশ ফেটে। অপরাপর,

পৌরাণিক কাহিনীতেও এরকম উদ্ভট কিচ্ছা-কাহিনী বিবৃত হয়েছে।

অসত্য বলতে অক্ষম আদিম সমাজের মানুষজন হতে দাস সমাজের মানুষজন একধাপ উন্নত সমাজের লোক বটে । তবে, এই একধাপ উন্নত দাস সমাজের রাজা তথা শাসকেরা নিজেদের পরজীবিতার সংকীর্ণ স্বার্থে এসব মিথ্যা-বানোয়াটি কাহানী রটনা করে তা প্রচলন করে মানব সমাজে অসত্য, মিথ্যা, প্রতারণা, তঞ্চকতা ইত্যকার বিষয়গুলো চালু করে কার্যত অন্যায় ও অন্যায্য ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে ন্যায্যতা ও গ্রাহ্যতা দিয়ে তা স্থায়ী করে অযৌক্তিক ব্যক্তিগত সম্পত্তিবানদের অন্যায়, অন্যায্য ও অযৌক্তিক স্বার্থের সেবা করা ও তা রক্ষা করার জন্য এসব মিথ্যাচার করেছিল।

অতএব, *ব্যক্তিগত সম্পত্তি হচ্ছে বর্ণিত সকল মিথ্যাচার, তঞ্চকতা, চালাকি ও চাতুরালীর মূল কারণ।* সুতরাং, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভিত্তিক, শোষণমূলক ও শ্রেণী বিভক্ত দাস সমাজ ঐতিহাসিকভাবে ছিল এক অনিবার্যতা কিন্তু তা ছিল না ন্যায্য। আর এই অন্যায্য ও অযৌক্তিক সমাজ- দাস সমাজেই বর্বরতার সর্বোচ্চ রূপ- মানুষ কর্তৃক মানুষের শাসনের সূচনা হয়। আর শাসনের নিমিত্তে মানুষ কর্তৃক মানুষকে বন্দী তথা পরাধীন করা হয়। অতঃপর, *ব্যক্তিমালিকানা, রাষ্ট্র, রাজনীতি ও পরাধীনতা কেবল একই সূত্রে গাঁথাই নয় বরং অবিচ্ছিন্ন ও অংগাংগিভাবে জড়িত।*

রাজনীতি দ্বারা শোষকদের স্বার্থ রক্ষার রাজনৈতিক সেবক তথা দাসতন্ত্রের শাসকদের শাসনের উৎস রাজনৈতিক ক্ষমতা বিষয়ে বানোয়াটি রাজনৈতিক বিবরণ দ্বারা দাস ও অন্যান্য বর্গের ব্যক্তিদেরকে এমনকি শাসিতদের অস্তিত্ব বিষয়ে তথা রাজানুকুল্যে জন্মানো, বেঁচে বা মরে যাওয়ার বিষয়ে বিভ্রান্ত করা সম্ভব হলেও পূর্বেকার আদিম সমাজের মুক্ত তবে পরবর্তীতে পরাজিত মানুষদের বা তাদের উত্তরসুরি যারা বন্দী তথা দাস হয়েছিল তাদেরকে কেবলই রাজনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ছিল না বলে শোষক দাসমালিকদের রাজনৈতিক সেবক-শাসকদের শাসনের ভিত্তি-ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং তা সংরক্ষায় রাজনৈতিক ক্ষমতাকে পাকা-পোক্ত করতে তৈরী করল আইন।

আইন অমান্য ও ভংগ করাটাই হলো বেআইনী বা অবৈধ কর্ম এবং দন্ডনীয় অপরাধ । আর অপরাধের শাস্তিবিধান করাটাও রাজার বা শাসকের কাজ। যে ব্যক্তি নিজেই অন্যায় ও অন্যায্য ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে ন্যায্যতা ও গ্রাহ্যতা দিতে সম্পূর্ণত অন্যায়ভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের মালিক হওয়া সহ মানুষদেরই একাংশকে দাস বানিয়ে মনুষ্য প্রজাতিকে ভাগ-বিভাগ করে মানুষের মানুষ পরিচয় মুছে দিয়ে নিজে অভিজাত ও পরজীবী শ্রেণীভুক্ত এবং সম্পত্তিবান তথা দাসমালিকদের শাসক শ্রেণী তথা অভিজাত শ্রেণী হিসাবে গণ্য করে দাসদেরকে মানবিক পশুতে পরিণত করে দাসদেরও মনুষ্য পরিচয় মুছে দিয়ে কার্যত অবিভক্ত মানবজাতিকে শ্রেণীতে রূপান্তরিত ও বিভক্ত করে চরম অমানবিকতার কাজ করেছে কার্যত সমগ্র মানবজাতির বিরুদ্ধে অন্যায় করেছে সেই অন্যায়কারী শাসকেরা তাদের

পরজীবীতার অন্যায় ও অন্যায্য স্বার্থকে বজায় ও বহাল রাখতে শোষিতদেরকে দমন পীড়ন করতে রাজনৈতিক ক্ষমতার জোরে আইনের সূচনা, চালু ও বহাল করে সেই আইন অমান্য করাটাকে বেআইনী এবং ক্রিমিনাল আইন ভংগ করাটা অপরাধ হিসাবে সাব্যস্ত করে শোষিতদেরকে জন্মসূত্রে অপরাধী হিসাবে গণ্য করেছে। মানুষের প্রকৃতি বা চরিত্র নিয়ে চরম মিথ্যাচার তবে শোষিত মানুষকে বিভ্রান্তকরণে সহায়ক বটে এমন ভূয়া নিদান।

অথচ, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, রাষ্ট্র ও রাজনীতি চালু হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ আদিম সমাজে কোনো অপরাধ ছিল না কারণ তখন আইনও ছিল না । তাই, অপরাধের জন্য দন্ড বা শাস্তির বিধানও আদিম সমাজে ছিল না। তাই, আদিম সমাজে কেহ ছিল না অপরাধী। তাছাড়াও, শোষক-শাসকদের দন্ডবিধি মতোও একজন ব্যক্তি ক্রিমিনাল আইনের কোনো একটি ধারা ভংগ করাটা দন্ডনীয় অপরাধ করে থাকে ওদের বিধানে। কিন্তু, তাতেও কি কোনো ব্যক্তি জন্মগতভাবে বা সমগ্র জীবনবাপী অপরাধী? না। আইন লংগন বা ভংগ করার নাম অপরাধ হচ্ছে শাসকদের নির্ধারিত একটি ক্রিয়া মাত্র কিন্তু তাই বলে কোনো মানুষই আজন্ম অপরাধী নয়। অথচ, দাস সমাজের শাসকদের স্বার্থে সৃষ্ট মতাদর্শ ও দর্শনে কিছু কিছু মানুষকে জন্মগতভাবে এবং আজন্ম অপরাধী চিহ্নিত করা হয়েছে।

অতঃপর, *মানুষ জন্মসূত্রে অপরাধী আর ওরা মানে রাজারা ডিভাইন রাইটহোল্ডার দুটোই সমান মিথ্যা*। আইন প্রনয়ণকারী থাকলে আইন প্রণীত হয় আর আইন প্রণীত হলে তা প্রয়োগ

করার কর্তৃত্ব থাকা আবশ্যক। দাসতন্ত্রে এই সব কাজগুলো সাধারণত রাজা একাই করতেন। তাই দাসতন্ত্রের রাজারা ছিলেন বটে চরম কর্তৃত্বপরায়ন ও একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। রাজাজ্ঞা অমান্যে রাজপুত্রকেও দন্ড পেত হত এমনকি, চ্যাংগিস খান সহ বহু রাজা নিজের বিদ্রোহী পুত্রকে হত্যা করেছে এবং রাজ পরিবারগুলোতে পিতা-পুত্রে বহু যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। আবার পুত্রের নিকট পরাজিত হয়ে ৮ বছর গৃহবন্দী থেকে মৃত্যুবরণ করেছে মোগল স্ম্রাট শাহজাহান। এমনটা ঘটেছে বটে দুনিয়ার বহু রাজ পরিবারে।

অতঃপর, আইন বাস্তবায়নে বিচারের ব্যবস্থা ও তদ্বিষয়ক বিহীতাদি করতে হয়েছে রাজাকে। বিচারও করতেন বটে রাজাই । ভারতের মোগল ডাইনেস্টীর স্ম্রাট আকবর নিজে প্রতি সোমবারে বিচারকার্য পরিচালনা করত। আসলে, দাস সমাজ প্রতিষ্ঠাকালে মানুষেরা পরস্পরকে হত্যা-খুন, জখম এর মতো হিংস্র ক্রিয়াদি সংঘটিত করেই বিজয়ীরা দাস মালিক তথা শোষক- শাসক শ্রেণী হয়েছিল। কিন্তু, দাসেরা বা শোষিতরা বা শাসিতরা সুযোগ পেলেই দাসমালিকদের অস্বীকার করবে না এমনটি নিশ্চিত হতে পারেনি দাস সমাজের বর্বর শাসকেরা। তাই, কার্যত ভয়ে ভয়ে দিনাতিপাত করতো বলেই রাজারা থাকত বটে দেওয়াল ঘেরা বাড়ীতে স্বশস্ত্র পাহারাধীনে। অতঃপর, *ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পিত হত্যা, খুন, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি তথা যুদ্ধ করার জন্য দাস সমাজেরই ভীতু তবে হিংস্র রাজারাই প্রতিষ্ঠা করল স্বশস্ত্র বাহিনীর।*

দাস সমাজের শাসকেরা নিজেদের শ্রেণী স্বার্থ রক্ষা করতে দাসদেরকে সদা নিয়ন্ত্রণে রাখতে কার্যত দাসত্বের যন্ত্রণা ও দুর্ভোগে ভোগা দাসেরা তাদের দাসোচিত জীবনকে অস্বীকার করে দাস মালিকদের অস্তিত্ব বিপন্ন করতে পারে এমন ভয় ও আশংকা হতেও রাজারা আইনকানুন তৈরী করেছিল। আবার, দাস মালিক সহ যাবতীয় সম্পত্তির মালিকেরা তদের সম্পত্তি কিভাবে ভোগ-দখল ও রক্ষণা-বেক্ষণ করবে বা সম্পত্তি রেখে কেহ মারা গেলে কে কে তার পরিত্যাক্ত সম্পত্তির মালিক হবে বা মালিক হওয়ার মতো কেহ না থাকলে রাজা কিভাবে সেই সম্পত্তি অধিগ্রহণ করবে বা কোনো সম্পত্তিবানের সম্পত্তি যাতে অবৈধভাবে বেহাত বা হস্তান্তর হতে না পারে ইত্যকার কারণে রাজারা প্রথমে মৌখিকভাবে আইন প্রণয়ন করত এবং পরবর্তীতে লিখিতভাবে আইন তৈরী করেছে।

এটাতো পরিষ্কার যে, যেখানে যেদিন এক গোষ্ঠী মানুষ আরেকগোষ্ঠী মানুষকে পরাজিত করে বিজয়ীরা কিংডম প্রতিষ্ঠা করেছিল সেদিনই সেই কিংডমের কিং কিছু ফরমান জারী করতে হয়েছিল বিজয়ীদের বিজয়কে অক্ষুন্ন ও অটুট রাখতে এবং পরাজিতদেরকে দাস বানিয়ে দাস হিসাবে থাকতে ও জীবনপাত করতে বাধ্য করতে। অতঃপর, *ব্যক্তিগত সম্পত্তি, রাষ্ট্র, রাজা, রাজনীতি এবং আইন যা হচ্ছে একটি শক্তিশালী শিকল য'দ্বারা যে কাউকে বা সংশ্লিষ্টদেরকে আটক,বন্দী তথা পরাধীন করা যায় সেই আইনসহ উল্লেখিত সবই একই সূত্রে গ্রথিত এবং একে-অপরের অবিচ্ছেদ্য অংশ।* তাই, এসবগুলোই মানুষ মানুষকে পরাধীন করার কার্যকর হাতিয়ার।

পৃথিবীর প্রথম লিখিত আইন হিসাবে বিবেচনা করা হয় **Code of UrUk Agina2380-60 BCE ,** কিন্তু, ইহা এখন পাওয়া যাচ্ছে না। তবে, **Code of UrNammu- 2100 - 2050 BCE ,** যা আবিস্কৃত হয়েছে ১৯৫২ সালে তার প্রথম অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে খুনের বদলে খুন, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ডাকাতির জন্য খুন, তৃতীয় অনুচ্ছেদে অপহরণের জন্য কারাদন্ড ও রৌপ্যমুদ্রা জরিমানা , চতুর্থ ও পঞ্চম অনুচ্ছেদে দাসদের অবস্থা বিষয়ে , ৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদে কোনো কুমারীকে সম্ভোগ করলে সম্ভোগকারীকে খুন এবং পরবর্তী ধারাগুলোতে বিবাহ, দাসেরা পালিয়ে গেলে সাজা , দাস তার মালিককে অস্বীকার করার সাজা, ব্যভিচারের সাজা মানে মৃত্যুদন্ড ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। এতেইতো প্রমাণ হয় যে অত্র আইন প্রনয়ণকারী কিং কি পরিমাণ ভীতু ও হিংস্র ছিলেন।

Code of Hummurabi- 1760 BCE , যা আবিস্কৃত হয়েছে ১৯০৩ সালে তাতে
১৩ সংখ্যাটিকে আন লাকি বিবেচনায় ১৩ নম্বর অনুচ্ছেদ উল্লেখ না করে ২৮৩ কার্যত ২৮২ অনুচ্ছেদের একটি আইন সংহিতা । কিন্তু, এটিও শুরু হয়েছে খুন দিয়ে এবং এই সংহিতার নীতিগত ভিত্তি ছিল জীবনের বদলে জীবন, চোখের বদলে চোখ, হাতের বদলে হাত এবং নাকের বদলে নাক। মাটি চাপা দিয়ে খুন, পানিতে ডুবিয়ে খুন, গলা কেটে খুন এবং কেবল খুনেরই বিধান সম্বলিত বর্বর হাম্মুরাবির সংহিতায় পলাতক দাসকে পূর্ব মালিকের নিকট ফেরৎ না দিয়ে আশ্রয় দিলে আশ্রয়দাতাকে

হত্যা করা এবং এমনকি একটা ছাগল চুরির দন্ডও ছিল মৃত্যুদন্ড। এটি মূলত খুনের নিদান পত্র। পরজীবীতা হারানোর ভয়ে চরম ভীত ও আতংকিত না থাকলে কেহ কি এত্তোটা হিংস্র হতে পরে?

প্রাচীন গ্রীসের আতংকিত রাজা ডেকোর কোড-খ্রষ্টপূর্ব ৬২১ । তাতেও খুনাখুনি ও কারাদন্ডের বিধান ও জরিমানা বিবৃত হয়েছে ভয়ানকভাবে। এমনকি, একটি আপেল চুরির দন্ড ছিল মৃত্যুদন্ড আর কোনো দেনাদার দেনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে তাকে পাওনাদারের দাসে পরিণত হওয়ার বিধানও ছিল। দাস বেচা-কেনার বিষয়টিও ডাকোর কোডে বিবৃত হয়েছে। মানুষ হয়ে মানুষকে সম্পত্তি বানিয়ে সে সম্পত্তি ব্যবহার সহ বেচা-কেনার যে বিধান দাস সমাজের বর্বর ও হিংস্র শাসকেরা দিয়েছিল তা যদি মানবিকতার চরম অমর্যাদা না হয় তবে বর্বর শাসকদের কোনো কাজই অমানবিক হতে পারে না।

আদিম সমাজের মানুষেরা পরিপূর্ণ মানবিক বোধ সম্পন্ন মানুষ ছিল না কিন্তু মানুষতো ছিল। আর সেই মানুষদের মানবিক মর্যাদাকে অস্বীকার ও রহিত করেছে দাস সমাজের শাসকেরা। তাতে, *শাসক হিসাবে দাস সমাজের শাসকেরা নিজেদের মানবিক মর্যাদাই কেবল হারায়নি বরং কেবলই ব্যক্তিগত সম্পত্তির বলে মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণ করতে গিয়ে বর্বরতার নিকৃষ্টতম ধরণ- মানুষ কর্তৃক মানুষকে শাসন করতে গিয়ে নিজেরাই চরম বর্বর হিসাবে ইতিহাসে নিজেদের ঠাঁই করে নিয়েছে বলেই তারা মানুষ কর্তৃক মানুষকে খুনের মতো চরম হিংস্রতার দুস্কর্ম করার বিধান দিয়ে তাদের কথিত আইন*

সংহিতা রচনা করেছে। ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী দেবরাজ ইন্দ্র মহাঋষি বিশ্বামিত্রের ধ্যানে ভীত হয়েছিল। কারণ, ইন্দ্রের মনে হয়েছিল যে হয়তো তার ক্ষমতা হ্রাস বা পদচ্যুতির নিমিত্তে বিশ্বামিত্র ধ্যানে মগ্ন হয়েছে। কিন্তু, ইন্দ্র নিজের ক্ষমতাকে বহাল রাখতে নিজের সভার উর্বশী, রম্বা প্রমুখ অপ্সরাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম রূপসী মেনকাকে পাঠালেন বিশ্বামিত্রের ধ্যান ভাংগিয়ে তকে কামে লিপ্ত করতে যাতে বিশ্বামিত্র তার ধ্যান সফল করতে না পারে। মেনকা তা করতে সফল হল। অতঃপর,ঋষী বিশ্বামিত্র এবং নৃত্য ও যৌনকলায় বিশেষভাবে পারদর্শী মেনকার মিলনের ফলে জন্ম হল শকুন্তলার। শকুন্তলার দায় নেয়নি বিশ্বামিত্র ও মেনকা। দুজনেই ভয়ানক রকমের নিষ্ঠুর নয়কি? তবে, ঋষি কম্ব নিজ আশ্রমে শকুন্তলাকে লালন-পালন করে। রাজা দুস্মন্তের সাথে শকুন্তলার বিয়ে হয় একান্তে দুজনের সম্মতিতে আর তাদের সন্তান হচ্ছে ভারত ভুমির মালিক -কিং ভারত। সেই রাজা ভারতের ভারত অধিপতি হওয়ার গ্রাহ্যতা ও যৌক্তিকতা প্রদানে রচিত পৌরাণিক কাহিনী মতে মনু হচ্ছে দুনিয়ার প্রথম মানুষ। অতঃপর, নারীকে প্ররোচনাকারী ও কামের কামিনি এবং সম্ভোগের সামগ্রী গণ্য করে নারী চরিত্র নির্ধারণকারী মনু কোড খ্রীষ্টপূর্ব ১০০ তে রচিত যাতে ১২ অধ্যায়ে মোট ২,৭০৯ অনুচ্ছেদ আছে।

মনুর বিধান অমান্যে ইহকাল ও পরকালের সাজা বিধান করে ইহকালের সাজা বিধানে রাজার ক্ষমতা ও এখতিয়ার সহ দাস ব্যবস্থা বহাল ও অটুট রেখে অন্যায় ও অন্যায্য

ব্যক্তিমালিকানাকে বহাল রেখে ব্যক্তিগত সম্পত্তিবানদের স্বার্থ নিশ্চিত করতে বহু রকমের সাজার বিধান রেখে রাজা সহ কে কি করবে বা করবে না, অথবা, কে কি খাবে বা খাবে না অথবা, কে কি পরবে বা পরবে না অথবা কে চুল-দাঁড়ি কখন কিভাবে কাটবে বা কাটবে না অথবা, অথবা কে কিভাবে নিজেকে পরিষ্কার রাখবে বা রাখবে না, কার শরীরের কোন কোন অংশ পুত-প্রবিত্র আর কোন কোন অংশ অপ্রবিত্র, কে কাকে কিভাবে বিবাহ করতে পারবে বা পারবে না বা নারী ও স্ত্রীর কি কি দায়িত্ব বা দায়িত্ব নয় তা স্ববিস্তারে বর্ণিত হয়েছে অত্র মনু সংহিতায়।

অত্র সংবিধানে ১ম অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ৩১ এ বিবৃত হয়েছে যে মনুর মুখ হতে সৃষ্ট হয়েছে ব্রাহ্মণ, বাহু হতে ক্ষত্রিয়, উরু হতে বৈশ্য আর পা হতে শুদ্র। একই অধ্যায়ের ৮৮ ধারায় সমাজের মাথা গুরু ব্রাহ্মণের পেশা- টিচিং, ৮৯ ধারায় রাজা সহ ক্ষত্রিয়দের কাজ হচ্ছে সমাজের মানুষকে রক্ষা, ৯০ ধারায় মহাজনী সহ ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাষাবাদ করা হচ্ছে বৈশ্যদের কাজ এবং ৯১ ধারায় বলা হয়েছে উল্লেখিত উপরতলার ৩ বর্ণের ব্যক্তিদের পায়ের নীচে অবস্থানকারী শূদ্রদের কাজ হচ্ছে উপরোক্ত ৩ বর্ণের ব্যক্তিদের সেবা করা। মূলত, দাসদের স্থান যে বর্ণিত ৩ টি কাস্টের পদতলে তাও নিশ্চিত করতেই তাদের জন্মটাও হয়েছে মনুর পা হতে এমনটাই ৩১ ধারায় বিবৃত হয়েছে। আদিম সমাজে মানুষে মানুষে ভাগ-বিভাগ, প্রভেদ ও বৈষম্য না থাকলেও আর্য ভারতের শাসকদের আইনে মানুষে মানুষে কেবল ভাগবিভাজনই নয় বরং চরম প্রভেদ ও প্রকট

বৈষম্য তৈরী করে মানুষে মানুষে ভয়ানক বিরোধবৈরীতা ও হিংসা-ঘৃণার বিষাক্ত সামাজিক পরিবেশ তৈরী করা হয়েছে। অতঃপর, ব্যক্তিগত মালিকানা হতে উদ্ভূত হিংসা ও ঘৃণার বোধেও মানুষ বন্দী তথা পরাধীন।

অত্র মনু সংহিতার অধ্যায় ৫ এর ধারা-১৪৭, ধারা-১৪৮, ধারা-১৪৯, ধারা-১৫০, ধারা-১৫১ এবং ধারা-১৬১ সহ আরো অন্যান্য অধ্যায়ের নানান ধারা মতে নারীরা শিশুকালে পিতার, বিবাহিত জীবনে স্বামীর এবং স্বামীর অনোপুস্থিতিতে পুত্রের অধীন এবং তাদের অর্থাৎ নারীদের কোনো স্বাতন্ত্রতা নাই এমনকি নিজ বাড়ীতেও। পিতা, স্বামী বা পুত্রের চিন্তার বাহিরে কোনো চিন্তা করাটাও তাদের জন্য পাপ। বিবাহের ক্ষেত্রে পিতার পছন্দের পাত্র তা হোক রোগাক্রান্ত, বৃদ্ধ, পংগু বা প্রতিবন্দী কিন্তু তাকেই বিনা বাক্যে স্বামীত্বে গ্রহণ করতে হবে মেয়েকে। স্ত্রীর কাজ হচ্ছে ঘর-গৃহস্থালীর কার্যাদি ঠিক মতো করে আনন্দচিত্তে স্বামীর সকল কথা মান্য করা। তাছাড়া, স্বামীর সন্তান জন্মদান, লালন-পালন করা সহ স্বামীর সম্ভোগের জন্য সদা প্রস্তুত থাকা ও নিজের সতীত্ব রক্ষা করা আর অবিবাহিত মেয়েরা নিজের কুমারিত্ব রক্ষা করা।

দাস সমাজের শাসকেরা কম-বেশ সকলেই নারীর জন্য এমন বিধান দিয়েছে এবং অমান্যে পাথর ছুড়ে হত্যা করা সহ মনুর বিধান মতেও স্বর্গপ্রাপ্তি না ঘটা।

আদিম সমাজেও নারীরাই সন্তান প্রসব করত কিন্তু সন্তানকে লালন-পালন করত বটে সমাজের সকলে। নারীরাও সমাজের

সকলের সাথে শিকার ও খাদ্য সংগ্রহের কাজে সমানভাবে অংশ নিত। সমাজের সকলে মিলে সামাজিক কাজ করা বৈ নারীদের আলাদাভাবে ঘর-গৃহস্থালীর কাজের ধারণারও উদ্ভব হয়নি আদিম সমজে। দাস সমজের শাসকেরা দাস ও দাস মালিক শ্রেণীতে মানুষকে ভাগ-বিভাগ করে তা টিকিয়ে রাখতে কেবলই সন্তান প্রসবের হেতুবাদে নারীদেরকে এত্তোদিনকার সামাজিক কাজ হতে বিতাড়িত করে ঘরগৃহস্থালীর কাজে সীমিত করে কেবল নারী-পুরুষের ভাগ-বিভাজন করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং নারী ও পুরুষে চরম বৈষম্য তৈরী করে নারীদেরকে মহলে বন্দী করেছে।

নারীর কুমারিত্ব বা সতীত্ব বিষয়ক ধারণাই ছিল না আদিম সমাজে। কিন্তু, দাস সমাজে শরীরের কতিপয় অংগের ভিত্তিতে মানুষকে ভাগ করা হল নারী, পুরুষ ও হিজড়ায়। হিজড়ারা সন্তান উৎপাদনে অযোগ্য বলে তাদের সন্তান হবে না তাই, তারা পিতার সম্পত্তি রক্ষণা-বেক্ষণে অযোগ্য হেতু তাদেরকে উত্তরাধিকার হিসাবে গণ্য না করে কার্যত হিজড়াদেরকে পরিবার হতে বহিস্কার করার ব্যবস্থা করেছিল দাস সমাজের শাসকেরা যারা এনটামি বা জন্ম বৃত্তান্ত বা এন্ড্রোক্রাইনোলজি বিষয়ে ছিল এক্কেবারে অজ্ঞ। তবে, নারী বা পুরুষ বা হিজড়া জন্মানোর প্রকৃত কারণ না জানলেও বর্বর শাসকেরা টোটালি রাজনৈতিক কারণে নারী, পুরুষ ও হিজড়া জন্মানোর নানান আজে-বাজে বিবরণ দিয়ে সেই ভিতিত্তে সম্পত্তির উত্তরাধিকার, অভিভাবকত্ব ইত্যাদি নির্ধারণে নানান বিধান-নিদান দিয়েছে।

পূর্বাপর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তারা জানত যে নারীরা সন্তান প্রসব করে। তবে, পুরুষের বীর্য অর্থাৎ রক্ত তথা ঔরষে শিশুর জন্ম হয়। আসলে রক্ত আর সিমোন তথা পুরুষের বীর্য যে সমার্থক নয় তাতো জানা গেল মাত্র কিছুদিন আগে। তবু, রক্ত সম্পর্ককে আত্মীয়তা বা বংশ লতিকা নির্ধারণে যথার্থ বলে গণ্য করা হল তবে ভুয়াভাবে ।কেহ কারো রক্ত সম্পর্কিত নয় এমনটা জানা-বুঝার মতো অবস্থাই দাস কেন পুঁজিতন্ত্রের যৌবনেও তৈরী হয়নি। আর নবজাতক যে নারী ও পুরুষের সমান অংশীদারীত্বে তথা ২৩+২৩ মোট ২৩ জোড়া ক্রোমোজমে সৃষ্ট তাতো নিশ্চিতি হয়েছে মাত্র ১৯৫৭ সালে। আর নারী বা পুরুষ হিসাবে জন্মানোর জন্য যে নারী নয় বরং এক্স-ওয়াই ক্রোমোজমের অধিকারী পুরুষই দায়ী তাতো দাসতন্ত্রে চিন্তা করারও সুযোগ ছিল না। তবু, ওরা এসব বিষয়ে কেবল রাজনৈতিক বিবৃতিই দিয়েই ক্ষান্ত ছিল না বরং তদ্বিষয়ে মিথ্যাভাবে নারীকে দায়ী করেছে।

অতঃপর, সম্পত্তিবান ব্যক্তির সম্পত্তি যেন তারই ঔরসজাত সন্তান লাভ করে তা রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে তজ্জন্য নারী যাতে আদিম সমাজের মতো অবাধ যৌনতায় লিপ্ত হতে না পারে বরং কেবলই একজন পুরুষের সন্তান উৎপাদনের মেশিন হিসাবে কার্যকর থাকে সেজন্য নারীকে সামাজিক কাজ হতে প্রত্যাহার করে ঘর-গৃহস্থালীর কাজে নিয়োগ করে কেবলমাত্র বিবাহিত স্বামীকে তার শরীর ব্যবহারের সুযোগ নিশ্চিত করণে বিবাহ ও পরিবার প্রথা চালু করে দাস সমাজের শাসকেরা। ফলে, দাসেরা যেমন বন্দী হলো দাসমালিকদের শিকলে তেমন

মনুষ্য প্রজাতির একাংশকে কেবলই সন্তান প্রসবের দায়ে স্বামীর সম্পত্তি গণ্যে নারী হিসাবে চিহ্নিত করে মহলে বন্দী করে মহিলা হিসাবে সাব্যস্ত করে নারীদেহকে সম্ভোগের সামগ্রী হিসাবে চিহ্নিত করে দাসদের মতোই পরাধীন করল নারীদেরকে। আর সেজন্য নারীদের জন্ম বিষয়েও নানান পৌরাণিক কাহিনীতে নানান আজগুবি কথা বলা সহ নারীদেরকে নানান দোষে দোষী করা সহ পুরুষদেরও নানান দুর্ভোগ-দুর্দশা বা পাপের কারণ হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে নারীকে।

অতঃপর, নারীবাদীরা যেমন বলে থাকে যে পুরুষেরা নারীকে বন্দী করেছে তাই, তাদের মতে নারী মুক্তি মানে হচ্ছে পুরুষের মতো করে আচার-আচরণ করার অধিকার। কিন্তু, যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্য মনুষ্য প্রজাতির একাংশকে নারী হিসাবে গণ্য করে ঘরবন্দী করা হল সেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিষয়ে তারা একদম নীরব। পুরুষ হিসাবে চিহ্নিতকরণের অংগটি মানুষ্য প্রজাতির একাংশের আগেও ছিল কিন্তু তার কারণেতো বিপুল দৈর্ঘের আদিম সমাজে কোনো নারী কথিত পুরষের বন্দী হয়নি। অথবা, পুরুষ হিসাবে চিহ্নিত করণের অংগ- শিশ্নের কারণে দুনিয়ার কোথাও কোনো সমাজ তথা নারীবাদীদের মতে অথচ ভূয়া পিতৃতান্ত্রিক সমাজ গঠিত হয়নি এবং গঠিত হওয়ার কারণও নাই। তবে, সম্পত্তির মালিকানার ভিত্তিতে পিতার কর্তৃত্বাধীন পিতৃতান্ত্রিক পরিবার গঠন করেছিল দাস সমাজের শাসকেরা। কোথাও কোথাও মাতৃতান্ত্রিক পরিবারও ছিল, এখনো আছে তবে খুবই গুরত্বহীনভাবে।সম্পত্তির মালিক পিতা বৈ পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে অপরাপর পুরুষেরা যেমন পরিবারের

কার্যকর শাসক নয় তেমন মাতৃতান্ত্রিক পরিবারেও সম্পত্তির মালিক মা বৈ অপরাপর নারীরা পরিবারের কর্তা বা শাসক নয়। অতঃপর, *দেহের কোনো অংগ নয় বরং নারী-পুরুষে ভাগ-বিভাজন, বিরোধ-বৈরীতা ও বৈষম্যের কারণও বটে ব্যক্তিগত সম্পত্তি*। দেহের বিশেষ কোনো অংগ নয় বরং ক্ষমতার উৎস হচ্ছে সম্পত্তি। হাল আমলেও বহু নারী ক্ষমতাবান বটে কেবলই সম্পত্তির কারণে যেমনটা আছে মাতৃতান্ত্রিক পরিবারেও।

শাসক নারী না পুরুষ তাতো বিবেচ্য নয় বরং শাসক মানে শাসকই যার কাজ হচ্ছে শাসন করা তথা অবাধ্যকে বাধ্য করতে দমন-পীড়ন করা। তাইতো, শাসন মানে হচ্ছে শাসিতরা শাসকের হুকুম-নির্দেশ মতো জীবন-যাপন করা অন্যাথায় হত্যা সহ নানান দন্ডে দন্ডিত হওয়া অর্থাৎ শাসন মানে হচ্ছে শাসিতদেরকে দমন-পীড়ন করে শাসকের বশীভূত করা। দাস সমাজের শাসকেরা মুক্ত মানুষকে যেমন দাস বানিয়েছে তা হোক পরাজিত করে বা বেচাবিক্রির মাধ্যমে তেমন তারা ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে অটুট ও বহাল রাখতে কেবলই সন্তান ধারণের সক্ষমতার দায়ে সন্তান প্রসবকারীদের নারী হিসাবে চিহ্নিত করে তাদেরকে পিতা, স্বামী ও পুত্রের অধীন করে নারীকে নিজস্ব স্বকীয়তা ও সত্ত্বা হতে বঞ্চিত করেছে। মিশরের সম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা বা ভারতের সুলতানা রাজিয়াতো শাসক ছিলেন তবে, দাসতন্ত্রের নিদানে তারা ছিলেন বটে নারী । কিন্তু, তারা বা পরবর্তীতে আরো যতো নারী শাসক হয়েছেন তারা কেহ কি নারীর মুক্তির বিধান করেছে নাকি

সম্পত্তিবানদের সম্পত্তি সংরক্ষায় পুরুষ শাসকদের মতো শাসন তথা দমন-পীড়ন করেছে?

তবে, দাসতন্ত্রের সেবায় রচিত অন্ধ হোমারের মহাকাব্যে গ্রীসে পিতৃতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় অনুঘটক ছিল বটে গ্রীসের যুদ্ধ দেবী এথেনা। হোমার তার মহাকাব্যে বিবৃত করেছেন যে পিতার হত্যার দায়ে মাকে হত্যাকারী পুত্রের সাথে পিতার হত্যাকারী মায়ের ছিল না রক্তের সম্পর্ক তাই, পিতার হত্যাকারী নিজ মাতাকে হত্যা করে কোনো অন্যায় বা অপরাধ করেনি বটে মাতৃহত্যাকারী পুত্র এমন রায় দিয়ে পুরুষের জয় ডংকা নাকি বাজিয়েছে কেবল নারী নয় বরং ধর্ষিতা নারী যুদ্ধদেবী এথেনা। দাসতন্ত্রের যৌনবিধিকে কার্যকর করতে কার্যকর হোমারের আরেকটি কাব্যে রাজা ইডিপাসকে কামে প্ররোচনাকারী তার নিজের মায়ের সাথে কামে লিপ্ত হওয়ার দায়ে ইডিপাসকে শাস্তিস্বরূপ নিজের দুই চোখ নিজ হাতে উপড়ে ফেলে অন্ধ হতে হয়েছিল । অতঃপর, গ্রীক মাইথোলজিতে নারী যেমন প্ররোচনাকারী তেমন ভারতীয় মাইথোলজিতেও এবং তা সমর্থিত হয়েছে বটে মনুর নিদানেও।

অতঃপর, দাসতান্ত্রিক সমাজকে স্থায়ীকরণে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে বৈধ উত্তরাধিকারের মাধ্যমে রক্ষা ও সংরক্ষার প্রয়োজনে শিশ্ন, যোনি ইত্যাদি অংগের এরকম নামাকরণ করে এসবকে লিংগ হিসাবে চিহ্নিত করে লিংগের ভিত্তিতে মানুষদেরকে ৩ ভাগে বিভক্ত করে লিংগের ভিত্তিতে পরিচয় নির্ণয় করে লিংগ ভিত্তিক ভুমিকা নির্ধারণ করার যে নীতিমালা তৈরী করেছে দাস সমাজের শাসকেরা তা হচ্ছে লৈংগিক রাজনীতি। অতঃপর,

দাস সমাজের কাল হতে এখনো পর্যন্ত পুঁজিতান্ত্রিক সমাজেও লৈংগিক রাজনীতি চালু ও বহাল আছে। সুতরাং, নারীপুরুষের সরাসরি মিলন ব্যতিরেকে সন্তান জন্ম দেওয়া ও নারীকে পুরুষে বা পুরুষকে নারীতে রূপান্তর করার সুযোগ সৃষ্টিকারী পুঁজিতন্ত্রেও লৈংগিক রাজনীতির বোধে বন্দী তথা পরাধীন বটে মানুষেরা।

গোল্ডেন এগ হতে সূর্যের উৎপত্তি বিষয়ে মনু সংহিতায় যেমন কাল্পনিক তথা বানোয়াটি এবং আজগুবি বিবৃতি বর্ণিত হয়েছে, তেমন মেনিস কর্তৃক প্রাচীন মিশরীয় ডাইনেষ্টি প্রতিষ্ঠার সাফাইকারী বুক অব পিরামিড যা লিখিত হয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ সালে তাতেও পৃথিবীর উৎপত্তি বিষয়ে একদম ভুয়া, বানোয়াটি ও অসত্য বক্তব্য বিবৃত হয়েছে। আবার, হাম্মুরাবীর কোডেও বলা হয়েছে যে কিং হাম্মুরাবির কাজে সন্তুষ্ট হয়ে ঈশ্বর তাকে সম্রাট হিসাবে পদোন্নতি দিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যে শান্তি বজায় রাখতে সুর্যদেবতা সহ ৪ জন দেবতাকে পাঠিয়ে হাম্মুরাবীকে বর্ণিত কোডটি প্রদান করে অর্থাৎ হাম্মুরাবীর কোডটি একটি ঐশ্বরিক বিধান তথা আসমানী নিদান।

অতঃপর, নিজের কর্তৃত্ব বহাল রাখতে নিজের রচিত কোড নিয়েও মিথ্যাচার করছে বটে সম্রাট হাম্মুরাবী। আক্কাডিয়ান সম্রাট-সার্জনতো তাকে পিতাহীন তবে দেবী মায়ের সন্তান হিসাবে নিজের জন্ম বিষয়ে মিথ্যাচার করে নিজেকে জন্মসূত্রে ডিভাইন রাইট হোল্ডার হিসাবে দাবী করে তার রাজকীয় ক্ষমতা প্রাপ্তির ভুয়া বিবরণ দিয়েছে। গ্রীস ও রোমের প্রতিষ্ঠাকারীরাও তাদেরকে যথাক্রমে গড জেউস ও গড জুপিটারের বংশধর

হিসাবে নিজেদের জন্ম বিষয়ে ভুয়া ও বানোয়াটি গল্প তৈরী করে ঐশ্বরিক ক্ষমতাবলে তাদের রাজকীয় ক্ষমতাপ্রাপ্তির বানোয়াটি ও কাল্পনিক বক্তব্য দিয়েছে।

দাস সমাজের প্রতিষ্ঠাতাদের এসব বানোয়াটি বা হুকুমিমূলে সৃজিত রাজনৈতিক বক্তব্য সম্বলিত বিবরণাদিকে পৌরাণিক কাহিনী বলা হয়ে থাকে। কিন্তু, সকল পৌরাণিক কাহিনীতে রাজার ক্ষমতা ও ক্ষমতার উৎস সহ ব্যক্তি মালিকানার পত্তন বিষয়ে জেনে-বুঝে তবে সংকীর্ণ স্বার্থে মিথ্যাচার করেছে দাস সমাজের প্রতিষ্ঠাকারীরা ও শাসকেরা। উল্লেখ্য, একটি মিথ্যার ভিত্তিতে রচিত কোনো বিবৃতি হচ্ছে একগুচ্ছ মিথ্যার একটি বান্ডিল। অতঃপর, *ব্যক্তিগত মালিকানার প্রবর্তনে বা ব্যক্তিমালিকানার গ্রাহ্যতা দিতে বা অন্যায্য হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিমালিকানাকে ন্যায্যতা দিতে দাস সমাজের শাসকেরা যেসব বিবৃতি দিয়েছে তা যেহেতু মিথ্যা সেহেতু ব্যক্তিমালিকানার স্বপক্ষে বা তা সংরক্ষায় রচিত সকল গ্রন্থ বা রচনাদি হচ্ছে অসংখ্য মিথার এক একটি বড় বড় বান্ডিল।*

ব্যক্তিগত মালিকানা এখনো বিদ্যমান বিধায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে উদ্ভূত মিথ্যাচারের জালে আষ্টে-পৃষ্টে আটক হয়ে আছে শ্রেণী বিভক্ত মানবজাতির কম-বেশ সকলেই। সুতরাং, ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে উৎপত্তিকৃত তবে শাসকদের সৃষ্ট নানান মিথ্যার শিকলে এখনো বন্দী বটে পুরো সমাজ। যদিচ, আধুনিক পুঁজিতন্ত্রে আধুনিক বিজ্ঞানের বদলৌতে বিজ্ঞানীরা জগত, জীবন, ও মানুষের জন্ম ও উৎপত্তি বিষয়ে যথার্থ তথ্য তথা সত্য বিবরণ দিয়েছে । ফলে, জগত-জীবন ও মানুষ

বিষয়ে পৌরাণিক কাহিনীর অসারতা যেমন প্রমাণিত হয়েছে আধুনিক পুঁজিতন্ত্রের আধুনিক বিজ্ঞানে তেমন ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাজকীয় ক্ষমতার উৎস, উৎপত্তি ইত্যাকার বিষয়ের পৌরাণিক কাহানীর ভুয়ামিও নিশ্চিত হয়েছে।

তবু, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভিত্তিক পুঁজিতন্ত্রের শোষক-শাসক পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণী তার জন্ম হতে বিকাশ এমনকি, পুঁজি বিষয়েও মিথ্যাচার করেই যাচ্ছে । উপরন্ত, অপরিশোধিত শ্রম- পুঁজি এবং পুঁজিতন্ত্রী সম্পত্তিকে রক্ষা ও সংরক্ষায় পুঁজিতন্ত্রের একদা বিপ্লবী তবে হাল আমলের প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণী আশ্রয় নিচ্ছে দাস সমাজের রাজনীতির নিকট। ফলে, প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতিরা একচেটিয়া স্বৈরতন্ত্র ও ফ্যানাটিক রাজনীতির পৌরাণিক কাহানীর রম-রমা প্রচার -প্রচারণা করে যাচ্ছে যাতে এমনকি পুঁজি বিষয়েও বৈজ্ঞানিক সত্য এমনকি পুঁজি উৎপন্নকারী মজুরেরাও জানতে-বুঝতে না পারে অথবা, জগত, জীবন, মানুষ, ব্যক্তিগত সম্পত্তি তথা পুঁজিতন্ত্রী সম্পত্তি বিষয়েও মজুরেরা শাসকদের বানানো মিথ্যার জালে আটকে থেকে এমনকি নিজেদের মুক্তি বিষয়েও যেন বিভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন থাকে।

কেবল সুর্য বা পৃথিবী নয় বরং ইউনিভার্সের উৎপত্তি, বিলিয়ন বিলিয়ন নক্ষত্রাদির জন্মবৃত্তান্ত সমেত সৌরজগতের সূর্যের আয়ুষ্কাল; পৃথিবীর উৎপত্তি এবং পৃথিবীর আয়ুষ্কাল বা ভর আয়তন ও পরিধি এবং গতি; পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব সমেত প্রাণীদের বিকাশ; মানুষের জন্ম সহ মৃত্যু; এবং পুঁজি ও পুঁজিতন্ত্রী সম্পত্তি বিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের নানান যুগান্তকারী

আবিষ্কার ও তত্ত্বাদি বিদ্যমান থাকা অবস্থায়ও দুনিয়া ব্যাপী ওরা পুঁজি বিষয়ে মিথ্যাচার সহ নানান পৌরাণিক কাহানীকে এমনকি পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যাদি বিষয়ে নানান বিভ্রান্তিকর মিথ্যাচার করছে। ফলে, আধুনিক হওয়া সত্ত্বেও কেবলই পুঁজিপতি শ্রেণীর সংকীর্ণ স্বার্থে পুরো পুঁজিতন্ত্রী সমাজও রাজনৈতিক মিথ্যার ঘাঢ় চাদরে আচ্ছাদিত।

কোনো বিষয়ে যথার্থ বিবরণ তথা মিথ্যার সুযোগহীন সত্য অর্থাৎ বিজ্ঞান হচ্ছে যে কোনো কিছুর গঠন, পুনর্গঠন বা সৃষ্টি বা রূপান্তর বা পরিবর্তনের কোড। অতঃপর, সেই কোড তথা বৈজ্ঞানিক বিবরণ ও বিবৃতি বিদ্যমান থাকলেও মানব জাতির পরজীবী ভগ্নাংশ তথা শোষক- শাসকদের তৈরীকৃত ও সৃজিত এবং বহালকৃত অসংখ্য মিথ্যার শিকলে বন্দী তথা পরাধীন বটে পুঁজিতন্ত্রের মানুষেরা।

অতঃপর, মিথ্যার কারণ ও উৎস- ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলুপ্ত করে জগত ও জীবন এবং মানুষ বিষয়ে এখনো পর্যন্ত চালু সকল মিথ্যার সমাপ্তি না করা পর্যন্ততো মানবজাতি স্বাধীন ও মুক্ত হতে পারবে না এবং মানুষেরা কার্যত অখন্ড মানবজাতির পরিচয়ও হাসিল করতে পারবে না। মানব প্রজাতিভূক্ত হয়েও ব্যক্তিগত সম্পত্তি মূলে বিভাজিত ও নানান শ্রেণীতে নানান রকমের ভেদা-ভেদ, বৈষম্য , বিরোধ ও বৈরীতা নিয়ে দিনাতিপাত করাটাও কার্যত অমানবিকতার জালে আটকে থেকে সমগ্র মানবজাতির কেহই প্রকৃত মানুষ হতে না পারাটাও মানুষেরই পরাধীনতা বটে।

উল্লেখ্য, শ্রেণী বিভক্ত সমাজে প্রত্যেকেই কোনো না কোনো শ্রেণীভুক্ত। তাই, প্রত্যেকেই নিজ নিজ শ্রেণীস্বার্থ বৈ সমগ্র মানবজাতির স্বার্থ বিবেচনায়ও অক্ষম ও অযোগ্য। তাইতো, সমগ্র মানবজাতির সকলের জন্য প্রত্যেকের সম বোধ তথা মানবিক বোধ কার্যকরের সুযোগহীন আধুনিক তবে শেষ ও চূড়ান্ত শোষণমূলক ও শ্রেণী বিভক্ত পুঁজিতন্ত্রেও কেহই পরিপূর্ণ মানবিকবোধ সম্পন্ন মানুষ হওয়ার সুযোগহীন। সুতরাং, মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্রেও কেহই পূর্ণ মানবিক বোধ সম্পন্ন মানুষ নয় বিধায় এখনো কেহই প্রকৃত মানুষ নয় হেতু মানবজাতির সকলে এখনো অমানবিকতার জালে বন্দী তথা পরাধীন।

দাস সমাজের শাসকেরা জগত, জীবন, মানুষের জন্ম এবং মানুষের সামাজিক বিষয়ে বানোয়াটি রাজনৈতিক বিবরণ দ্বারা বাস্তবের জীবনের অবাস্তব বা কৃত্রিম ধারণা বা মানুষে মানুষে স্বাভাবিক -মানবিক সম্পর্ক বৈ শোষক- শোষকের বানোয়াটি বা শাসক-শাসিতের কৃত্রিম অশোভন ও অমর্যাদাকর সম্পর্ক তৈরীর রাজনৈতিক নিদান ও বিধান দিয়ে শাসকদের সৃষ্ট বোধ তথা রাজনৈতিক বোধ দ্বারা যতই আচ্ছন্ন করুক না কেন তাতে বাস্তব জীবনের সাথে কৃত্রিম রাজনৈতিক পরিচয়ের কৃত্রিম জীবনের বিরোধ দেখা দেওয়াটা ছিল স্বাভাবিক।

আবার, সেই কৃত্রিম সম্পর্কের জীবনকে বহাল রেখে মানুষদের মধ্যকার শ্রেণী বিভাজনকে বহাল ও রক্ষা করে দাস সমাজের পরজীবী শ্রেণী- দাস মালিকদের স্বার্থ অটুট রাখতে দাস সমাজের শাসকেরা আইন তৈরী করেছে অথবা রাজত্বের মতোই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আইন কার্যকরী করে শোষিত

শ্রেণীর তথা পায়ের তলার ব্যক্তিদের পায়ের তলায় রেখে দেওয়া সহ সম্পত্তির মালিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বে-আইনী বা অবৈধ হস্তান্তর হতে রক্ষা করার চেষ্টা করতে হয়েছে। কিন্তু, শাসকদের বদমতলবে তৈরীকৃত আইন যে মান্য করবে না বন্দীত্বের যন্ত্রণায় ভোগা আইনের শিকলে বন্দীরা তাও জানা ছিল আইন প্রণেতা ও কার্যকরী করা কর্তৃত্ব তথা রাজা-বাদশা জাতীয় শাসকদের।

দাস যুগেও কেউ কেউ যেকোনো প্রকারেই হোক সম্পত্তিবান হওয়ার লোভে আইন ভংগ তথা চুরি, ডাকাতি, লুটপাট, প্রতারণা, মিথ্যাচার, হত্যা -খুন ইত্যাদি করত। কারণ, ব্যক্তিগত সম্পত্তিবানরা যে সম্পত্তির বদৌলতে আরাম-আয়েশী জীবন-যাপন করার সুযোগ নিচ্ছে সেই বিষয়টিতো ছিল বটে চোখের সামনেই। অতঃপর, অন্যায় ও অন্যায্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে তা লাভে লোভী হয়ে চুরি, ডাকাতি, অপহরণ গুম, খুন ইত্যাদির সূচনাতো হয়েছে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা হতেই। তাইতো, জন্মসূত্রে বা জন্মাবদি কোনো মানুষই লোভী নয় বা চোর-ডাকাত বা খুনি নয় ।অথচ, দাস সমাজের শাসকেরা নিজেদের সম্পত্তি ও ক্ষমতা লাভ-হাসিলে যা যা করত ঠিক সেসবকেই নিজেদের চরিত্রের প্রতিফলনে বলেছে যে মানুষ জন্মগতভাবেই চোর-ডাকাত, খুনি , তস্কর, লোভী ইত্যাদি । অতঃপর, ব্যক্তিগত মালিকানা ভিত্তিক আধুনিক তবে শশ্মান ঘাটে উপনীত পুঁজিতন্ত্রেও লোভের শিকলে বন্দী তথা পরাধীন বটে মানুষেরা।

অন্যায্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির ন্যায্যতা দিতে যে আইন শাসকেরা করেছে তা ভংগ করাকে অপরাধ গণ্যে কার্যত শাসকেরাই তাদের হীন ও অন্যায় স্বার্থে অপরাধ নামীয় আরেকটি কৃত্রিম বিষয়ের জন্ম দিয়ে মানুষকে মানুষ হিসাবে বিবেচনায় অক্ষমতা হেতু শাসকদের তৈরীকৃত আইন ভংগকারীকে দন্ড বিধানে কাউকে বিচারক আর কাউকে বিচারাধীন বা অভিযুক্ত গণ্য করে জন্মগতভাবে সমান উপাদানে সৃষ্ট মানুষদের একজন বিচারক হয়ে আরকেজনের বিচার করার প্রথা চালু করে মানুষে মানুষে সমান হওয়া সত্ত্বেও তা বিবেচনা না করে কার্যত মানুষের মানবিক মর্যাদাকে ভূতলবাসী করেছে দাস সমাজের শাসক নামীয় বর্বরেরা। অথচ, সেই বর্বরেরা নিজেদের বর্বরতা তথা দুস্কর্মাদিকে গোপন করে তা আড়াল করতে শাসকদের সংকীর্ণ স্বার্থে , প্রয়োজনে এবং হুকুমে তবে বানোয়াটি মূলে সৃজিত আদর্শবাদ ও দর্শনে মানুষের দুটো সত্ত্বা তথা সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, ভাল- মন্দ, অপরাধ-নিরাপরাধ বোধের বক্তব্য হাজির করে সামাজিক ব্যবস্থা নয় বরং কথিত অপরাধের জন্য সংঘটিত কর্মটি সম্পাদনকারী ব্যক্তিকেই দায়-দোষী গণ্যে সাজার বিধান দিয়ে অপরাধ ও দন্ড এই দুইটি মানুষের মর্যাদাহানিকর জঘন্যবোধের শিকলে মানুষকে বন্দী তথা পরাধীন করেছে তাদেরই সৃজিত আদর্শ বা মতাদর্শ ও দর্শনের মাধ্যমেও।

আর এরকম কৃৎসিৎ ও বিশ্রীবোধে আচ্ছন্নরা কেবল আইন-আদালতের তোয়াক্কা করে এমনটাই নয় বরং গুরুগীরির পেশাধারীদের কেহ কেহ যেমন অবাধ্য ছাত্রের বিচার করে বেত্রাঘাত সহ নানান শাস্তি দিয়ে তেমন পারিবারিকভাবে বাবা-

মাতো বটেই এমনকি পরিবারস্ত অন্যান্যরা যারা হয় বয়সে সামান্য বড় না হয় আয়-রোজগারে এগিয়ে তেমন ধরণের ব্যক্তিরাও পরিবারের অপরাপর সদস্য যারা পারিবারিক আনুগত্যেরও সামান্যতম হানি করে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করে যা কখনো হয়তো পরিবারচ্যুতি, না হয় মৃত্যুরও কারণ হয় আর গণপিটুনীর মতো নিষ্ঠুর তান্ডবের ঘটনাতো মাঝে মধ্যে ভয়ংকর রূপ লাভ করে। অসবর্ণে বিবাহের দায়ে তথাকথিত সম্মান রক্ষার জন্য হত্যাতো বৃটেনেও ঘটছে। অতঃপর, দাস সমাজের শাসকদের প্রবর্তিত শাসক-শাসিতের বোধেও এখনকার পুঁজিতন্ত্রের ব্যক্তিগণও বন্দী তথা পরাধীন বটে।

মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণের অবসান হলে মানুষ কর্তৃক মানুষের শাসনের অবসান হবে। সুতরাং, মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ- শাসনের অবসানে মুক্ত ও স্বাধীন হবে পরাধীন মানুষেরা। অতঃপর, পরাধীন ব্যক্তিরা পরাধীনতার দুর্ভোগ ও দুদর্শা হতে মুক্তি ও স্বাধীনতা চাইবে এটাওতো স্বাভাবিক। তাই, পরাধীনতা হতে মুক্তি লাভে আইন ভংগ বা অমান্যকারীদের দেশ-দ্রোহী বা রাষ্ট্রদ্রোহী হিসাবেও শাস্তি দেওয়ার জন্য মৃত্যুদন্ড সহ কারাবাস বা নির্বাসনের নিদান দিতে রাজারা যেমন আইন করেছে তেমন আধুনিক পুঁজিতন্ত্রেও এমন সব আইন গুলো নানান ধরণে বিদ্যমান। কারণ, বেচা-কেনা ভিত্তিক একটি বিশ্ব বাজার সমেত অসংখ্য পণ্যের বৈশ্বিক পুঁজিতন্ত্রী সমাজের ভিত্তিমূলও কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তি। অতঃপর, স্বার্থান্ধ ও বর্বর শাসকেরা যাহাই বলুক না কেন কার্যত কোনো মানুষই অপরাধী নয় এবং আদিম সমাজে অপরাধ শব্দটিও ছিল অজানা।

তবে, প্রত্যেকেই সমাজের বিদ্যমান শর্তাধীনে ক্রিয়াদি করে থাকে বলে সমাজের বিদ্যমান শর্তাদি হচ্ছে প্রত্যেকের ক্রিয়াদি নির্ধারণে নিয়ামক ফ্যাক্টর। তাই, কোনো মানুষের কোনো কাজের দায়ও একা তার নয় বরং সমাজের। ব্যক্তিমালিকানা বিলুপ্তিতে সামাজিক মালিকানার কমিউনিস্ট সমাজে অপরাধ, বিচার, সাজা, শাসন, আইন ইত্যকার তাবৎ বিষয় যা ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে উদ্ভূত ও শোষক-শাসক শ্রেণীর হীন স্বার্থে শাসকেরা যা সৃজন-চালু ও বহাল করেছে তা হবে সম্পূর্ণত অজানা বিষয়। তবে, আইন থাকলে তা ভংগ হবে এটা স্বাভাবিক তাই, জেনে-বুঝে আইন ভংগকে দন্ডনীয় অপরাধ গণ্যে দন্ড দিতে ক্রিমিনাল ল' তৈরী করেছে বটে চরম অন্যায়কারী বর্বর শাসকেরা। কিন্তু তাতেও নিরাপদ বোধ করেনি দাস সমাজের শাসকেরা।

তাই, রাজনীতি ও আইন প্রণয়ন ও জারী এবং বহাল রাখার পরও শাসকেরা নিজেদের রাজকীয় জীবনকে এবং দাস তথা শোষিতদের দাসোচিত জীবনকেই স্বাভাবিক জীবন গণ্য করে দাস সমাজকে স্বাভাবিক হিসাবে বিবেচনা করে দাসেরা নিজেই যেন দাস মালিকদের স্বার্থে প্রয়োজনে নিজের জীবনও বিসর্জন দেয় তাও স্বেচ্ছায় তেমন বোধের জন্য ওরা তৈরী করে নানান আদর্শবাদ বা মতাদর্শ এবং দর্শনেরও সূচনা করে ওরাই।

আদর্শবাদ বা মতাদর্শ এবং দর্শন যেহেতু দাস সমাজের শাসকদের রাজনৈতিক বোধের প্রতিফলনে ও পরজীবীদের সংকীর্ণ স্বার্থে তৈরী সেহেতু দাস সমাজের শাসকদের রাজনীতি, আইন , আদর্শবাদ বা মতাদর্শ ও দর্শনের বোধে

আচ্ছন্ন দাসেরাও স্বেচ্ছায় তাদের শোষকদের স্বার্থের জন্য যুদ্ধও করেছে, এখনো কেহ কেহ স্বয়ংঘাতি হচ্ছে তাদের বোধের বিশুদ্ধতা বা অকৃত্রিমতা রক্ষায় বা হত্যা করছে বটে তাদের এহেন জঘন্য বোধের সাথে সাংঘর্ষিক বোধের ব্যক্তি বিশেষকে।

অথবা, স্বামী ব্যতিত অন্য কোনো পুরুষ যদি কোনো নারীর সাথে স্বামীর মতো আচরণ করে তবে তাকে শাসকদের নিদানে ও বোধে ব্যভিচার বা কোনো ক্ষেত্রে ধর্ষণ হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। অথচ, নির্দোষ ধর্ষিতা নারী তার সতীত্ব রক্ষায় ব্যর্থ বিচেনায় তার সমগ্র দেহ অপেক্ষা কেবল নারীর পরিচয় চিহ্নিতকরণের অংগ তথা যোনিকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে বা শাসকদের বোধে নারী পরিচিতির ঐ অংগটির মধ্যেই একজন নারীর সকল মান-মর্যাদা ও সম্ভ্রম নির্ভরশীল বিবেচনায় বোকা ধর্ষিতা নিজেই হয়তো নিজের জীবনের জোরপূর্বক সমাপ্তি ঘটায় বা সুযোগ পেলে ধর্ষককেও খুন করে।

অথচ, অংগ বিশেষের মধ্যেই একজন ব্যক্তির জীবনচক্র বন্দী বা সতীত্ব, কুমারিত্ব বা ধর্ষণ ইত্যকার শব্দগুলো ও বোধ আদিম সমাজে ছিল অজ্ঞাত। তাই, দাসতন্ত্রের আগে প্রায় ৩ লাখ বছরের মানুষেরাতো না করেছে ধর্ষণ বা না কোনো ব্যক্তি ধর্ষিত হয়েছে বিধায় কোনো ব্যক্তির জীবন বা দেহ হতে তার একটি অংগকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে কোনো হত্যাকান্ডতো নয়ই বরং তেমন কোনো বোধেও নিজেকেও দায়-দোষী বিবেচনা করার কারণ ছিল না।

অতঃপর, শাসকদের তৈরীকৃত মতাদর্শিক বা আদর্শিক বোধে আচ্ছন্ন ব্যক্তিরা কথিত অপরাধে নিজেদেরকে দোষী সাব্যস্তে নিজেদেরকে নিজেরাই দন্ড প্রদানে শাসকদের এদ্বিষয়ক কাজ তথা বিচারিক ও দন্ড বিধানের কাজটি নিজেরাই করে শাসক-শোষকদের রক্ষা করতে সহায়তা করছে তাও আবার বিনা বেতনে। অবৈজ্ঞানিকতো বটে তবে এমন জঘন্য দাসোচিত বোধে আচ্ছন্ন ব্যক্তিরা নারীদেরকে যেমন সম্ভোগ সামগ্রী হিসাবে বিবেচনা করে তেমন পুরুষকেও গণ্য করে সুযোগ সন্ধানী ও সম্ভোগকারী হিংস্র জন্তু হিসাবে। অনুরূপ বোধে কেহই নয় মানুষ বরং সমাজে তাদের পরিচিতি হচ্ছে কেহ কামের কামিনী নারী আর কেহ সম্ভোগে উন্মত্ত তথা পুরুষ আর কামে অযোগ্য হিজড়া। মানুষের কি ভয়ানক অবমূল্যায়ন ও বেইজ্জতি তাও নিছক সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার হেতুবাদে। অতঃপর, *শাসকদের রাজনৈতিক, আইনী ও আদর্শিক বা দার্শনিক বোধে আচ্ছন্ন ব্যক্তি বিশেষ তো নারী - পুরুষ এবং হিজড়া রূপ কৃত্রিম ধারণায় বন্দী অর্থাৎ পরাধীন বটে।*

বস্তুত, রাজনীতি, আইন, আদর্শবাদ বা মতাদর্শ ও দর্শনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সমেত নীতি কথা, বা সুনীতি বিষয়ক বাণী ইত্যাদির সম্মিলিত মর্মার্থ দ্বারা যেসব আচার-আচরণ বা ক্রিয়াদি তথা সংস্কৃতি হিসাবে যা প্রকাশিত হয়েছে তাতে যেসব প্রথা, রীতি-নীতি চালু করা হয়েছে তা সংক্ষেপে এই ঃ কে কোন শ্রেণীতে বা বর্ণে জন্ম নিলে জন্মলাভকারীর পদবী সহ নামের ধরণ ও নামাকরণ, মুখে ভাত, খতনা ইত্যকার বিষয়াদি সহ জন্ম বিষয়ে কি কি আচার অনুষ্ঠান কখন কিভাবে করতে

হবে ; কে কার কার মৃত্যু দিবস কিভাবে উদযাপন করবে; কে কিভাবে কাকে নমস্য গণ্যে স্বীয় আনুগত্য নিশ্চিত করতে কে কিভাবে কি কি আচারআচরণ করবে ; কে কার সামনে কিভাবে দাঁড়াবে বা কিভাবে বসবে ; কে কাকে পা ছুঁয়ে বা সাষ্টাংগ প্রণাম করা সহ কিভাবে প্রণামি দিতে হবে; বিয়ে, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি কে কিভাবে করবে; পুজা-অর্চনা সহ নানান মাঙ্গলিক কাজ বলে অবহিত সামাজিক কাজগুলো কে কিভাবে করবে; কে কাকে গুরু মেনে গুরুবাক্য শিরোধার্য্য করে কে কিভাবে জীবন-যাপন বা জীবন পাত করবে; কে কিভবে নিজেকে শুদ্ধ ও পবিত্র করবে ; কে কিভাবে কখন স্নান করবে; কে কিভাবে কখন চুল-দাঁড়ি কাটবে; কে কখন কিভাবে বিশেষত মেয়েরা অলংকার সহযোগে সাজ-গোছ করবে; কে কখন কিভাবে সিঁধুর পরবে বা মুছবে? কে কাকে কি সম্বোধন কিভাবে করবে; কে কখন কি খেতে পারবে বা পারবে না তা সহ কে কিভাবে খাওয়া-দাওয়া করবে; কে কোন রংয়ের বা কোন পোষাক পরতে পারবে না সমেত কে কিভাবে কখন কি পোষাক বা কোন রংয়ের পোষাক পরিধান করবে; এবং কে মারা গেলে কার শেষকৃত্য কিভাবে করা হবে তথা কার মরদেহ মমি করে রাখা হবে আর কার মৃত দেহ কেটে-কুটে পাখির খাবার হিসাবে পাহাড়ের চূড়া হতে উড়িয়ে দিতে হবে বা কার লাশ কোন কাষ্টে পোড়াতে হবে বা কার লাশ জলে ডুবিয়ে দিতে হবে বা কার লাশ কবর বা মাটি চাপা দিতে হবে কিভাবে আর কার লাশ কুকুরের খাদ্য হিসাবে ফেলে দিতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

অতঃপর, দাসতন্ত্রে জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত প্রত্যেকে শোষকদের স্বার্থ রক্ষক বর্বর শাসকদের বা তাদের দোসরদের বানোয়াটি আইন- বিধি, নিয়ম-নীতি, রীতি-প্রথা, সংস্কৃতি ইত্যকার অসংখ্য শিকল সহ মতাদর্শগত বা কথিত আদর্শিক বোধের দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান বহু শিকলে বন্দী হয়েছে তবে বন্দী হয়েছে কার্যত মানুষেরাই। সুতরাং, মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণশাসনে কার্যত মানুষই পরাধীন হয়েছে কতিপয় স্বার্থান্বেষী -পরজীবি মানুষের পরজীবিতার নিমিত্তে। তাই, বিবৃত আচার-আচরণ, রীতি-নীতি-প্রথা ও সংস্কৃতি ইত্যাদি সহ শাসকদের সৃষ্ট সকল শিকল যতক্ষণ পর্যন্ত অবলুপ্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ততো মানুষ স্বাধীন ও মুক্ত হতে পারে না। আর উল্লেখিত সকল শিকলের উদ্ভব যখন হয়েছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে তখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলুপ্তি না করেতো মুক্তি ও স্বাধীনতা হাসিল করা সম্ভব নয়। আর, আধুনিক পুঁজিতন্ত্রেও যেসকল ব্যক্তি দাস সমাজের বর্বর শাসকদেরকে মহান বা অসাধারণ ব্যক্তি বিবেচনায় সেই বর্বর শাসকদের রাজনৈতিক বোধ সমেত তাদের চালুকৃত আচার আচরণ তথা শাসকদের বহালকৃত রীতি-নীতি, প্রথা-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি স্বেচ্ছায় মেনে চলে বা পালন করে তারা দাসোচিত বোধের জাতক।

উল্লেখ্য, দাস সমাজের শোষক-শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে অনেক দাস যারা দাসোচিত জীবন হতে মুক্তি চেয়েছিল। কিন্তু, আধুনিক বিজ্ঞানের নানান যুগান্তকারী আবিষ্কার এবং আইসিটি সহ উন্নততর যোগাযোগের আধুনিক পুঁজিতন্ত্রেও দাসোচিতবোধের জাতকেরা যেমন দাস সমাজের দাসদের

অধম তেমন শাসক ছাড়া বাঁচার বিষয়টি তারা ভাবতেও অপরাগ। সেজন্য, অনুরূপ দাসোচিত বোধের জাতকেরা বিদ্রোহ করতে অপরাগ হেতু প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণী মুক্তিকামী ও স্বাধীনতা প্রেমী- শ্রমিক শ্রেণীকেও দাসোচিত বোধে আচ্ছন্ন করে শ্রমিকদেরকে নিজেদের জীবন, স্বাধীনতা ও মুক্তি বিষয়ে বিভ্রান্ত করতে পৌরাণিক কাহিনী সমূহ প্রচারে বিপুল ব্যয় করছে এবং মহা সমারোহে উদযাপন করছে বটে বিবিধ পৌরাণিক কাহানীতে বর্ণিত নানান দেব-দেবী বা কথিত মহামানবদের জন্মমৃত্যুবার্ষিকী সহ শাসকদের প্রবর্তিত নানান পর্বাদি। হালের রাজনীতিকেরা প্রতিযোগীতা করছে বটে পৌরাণিক কাহিনীতে বিবৃত শাসকদের মতো শাসন কার্য পরিচালনায় কে কতটা যোগ্য বা সফল তা নিয়ে।

কার কোথায় জন্ম তা নির্ণয় বা নির্ধারণের কোনো কারণ ঘটেনি আদিম সমাজে। আবার আজকের মতো তখনতো পৃথিবী রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত ছিল না। তাই, আদিম সমাজের মানুষদের জন্মস্থান ছিল পৃথিবী ফলে, মনুষ্য প্রজাতির ঠিকানাও ছিল পৃথিবী। কিন্তু, দাসতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর হতে মানুষের জন্ম স্থান হল একটি দেশ বিশেষ ফলে, মানুষ তার ঠিকানা হারিয়ে পৃথিবীর একটা ক্ষুদ্র অংশকে ঠিকানা করে কার্যত অবাধ ও মুক্তভাবে গমণাগমন তথা মানুষ কর্তৃক বাধাপ্রপ্ত না হয়ে মানুষেরা পৃথিবীব্যাপী অবাধে চলাচলের সুযোগ হারাল। তাইতো, দেশের তথা রাষ্ট্রের সীমানা দ্বারাও বন্দী তথা পরাধীন হল বটে শ্রেণী বিভক্ত সমাজের মানুষেরা।

দাস সমাজে দেশের মূল মালিক ছিল বটে রাজা বা বাদশা আর রাজার বদৌলতে বা বদান্যতায় যারা যারা জমি এবং দাস সমেত দেশের নানান সম্পত্তির মালিক হয়েছিল তারা তথা দাস মালিকেরা সহ সেই সম্পত্তিবানরা ছিল দেশ তথা রাষ্ট্রের মালিক। তাই, দেশের মালিক হিসাবে সম্পত্তিবানরা ছিল দেশ ও রাষ্ট্র হতে প্রাপ্ত সুবিধাভোগী। কিন্তু, রাজার রাজকীয় শান-শওকত বাড়াতে স্বীয় রাজ্য সীমানা বাড়াতে বা একই মনোভাবে অন্য কোনো রাজা কর্তৃক কোনো রাজা আক্রান্ত হলে রাজাদের দেশ বা রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে রাজার দেশকে নিজের দেশ বিবেচনা করে জন্মভূমির প্রেমকে সর্বোচ্চ প্রেমের তকমা দিয়ে দেশপ্রেমের মোহনীয় আবেগী তবে মাদকীয় বয়ান যা রাসায়নিক ড্রাগ হতেও ভয়ংকর রাজনৈতিক ড্রাগ দ্বারা আচ্ছন্ন করে দাসদেরকেও যুদ্ধ করতে রাজী ও বাধ্য করত বটে খোদ রাজারাই। অথচ, কোনো রাজা বিজয়ী হলেও দাসদের দাসত্ব যেমন গোছেনি তেমন রাজা বিশেষ পরাজিত হলেও দাসদের দাসোচিত অবস্থার হেরফের হয়নি। কার্যত, যুদ্ধ করে জীবন নাশ করা বা যুদ্ধবন্দী হওয়া বা যুদ্ধাহত হলেও এসবের ক্ষতি বা যন্ত্রণা ভোগ করা ছাড়া দাসদের দাসোচিত অবস্থার কোনো হের-ফের হত না দেশপ্রেমের রাজনীতিতে। ফলে, দেশ রক্ষা হোক বা না হোক বা দেশের সীমানা বাড়ুক বা কমুক তাতে দাসেরা দাসই থেকেছিল দাস সমাজে আর সকল যুদ্ধের সুবিধাভোগী ছিল বিজয়ী রাজা ও তার দোষররা।

খাদ্য আহরণে পশু ও মৎস শিকার ও তা সংগ্রহ করে জীবন ধারণের আদিম সমাজ হতে দাস সমাজে অবতীর্ণ হওয়া

মানুষদের কৃষি নির্ভরতায় উৎপাদনে ভূমি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হয়ে পড়ায় দাস সমাজ বিলুপ্ত হয়ে ভূমি দাসত্বের সামন্ত সমাজের পত্তন হয়। এই পত্তনী কাজে যুদ্ধ-বিগ্রহ কম হয়নি। তবে, পৃথিবীর সর্বত্র একই সময়ে যেমন দাস রাষ্ট্র তথা দাস সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি তেমন দুনিয়ার সর্বত্র একই সময়ে সামন্ত সমাজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আর আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায়তো আদিম অবস্থায় অনুপ্রবেশ করে দাস রাখার সুবিধা সমেত পুঁজিতন্ত্রী অর্থনীতি চালু করেছিল বৃটেনের পুঁজিপতিরা। যদিও দুই দেশেই বৃটেনের অনেক দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে নির্বাসন দিয়ে সেখানে পুঁজিতন্ত্রী অর্থনীতিক পদ্ধতি চালু করেছিল বৃটেনের পুঁজিপতিরা। ভারতেও পুঁজিতন্ত্রের পত্তন করে বটে বৃটেন, ফ্রান্স ও পুর্তগীজের বিপ্লবী বুর্জোয়ারা। পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে সমগ্র পৃথিবীকে আবিষ্কার ও একত্রিত করে সমগ্র পুথিবীকে একটি পুঁজিতন্ত্রী বিশ্ব হিসাবে গড়ে তুলতে প্রাক পুঁজিতন্ত্রী সমাজের সুবিধাভোগী শাসকদের পরাজিত করতে যুদ্ধ, ঘুষ, দুর্নীতি, প্রতারণা, হত্যা ইত্যকার নানান নারকীয় দুস্কর্ম সংঘটন করলেও আধুনিক পুঁজিতন্ত্র বিকাশে তখনকার প্রগতিশীল পুঁজিপতি শ্রেণী একটি বিপ্লবী ভূমিকা পালন করেছিল। সামন্ততন্ত্রের শাসকেরা দাস সমাজের রাজনীতি, আইন-কানুন, আদর্শিক মতবাদ ও দার্শনিক বক্তব্য সমেত পুরোনো সমাজের রীতি-নীতি, প্রথা-ঐহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদিকে কেবল গ্রাহ্যতাই দেয়নি বরং আরো দৃঢ় হতে দৃঢ়তর করার প্রয়াশ চালিয়েছে। যদিচ, নব বধুর উপর সামন্তদের প্রথম রাতের অধিকার খারিজ করেছিল বটে সামন্ত শাসকই। ফলে, সামন্ত সমাজে শোষিত ভূমি দাসেরাতো

বটেই কার্যত সকল ব্যক্তিই বন্দী বা পরাধীন ছিল বটে ভূমি সহ শাসকদের অসংখ্য শিকলে।

ভূমি দাসত্বের সামন্ততন্ত্রে ভূমি ছিল উৎপাদনের মুল উপায়। তবে, ভূমিতে কৃষি উৎপাদন ক্রমাগত বাড়ানোর তাগিদে কৃষি যন্ত্রপাতি সহ ঘর-গৃহস্থালীর নানান উপায়াদি তথা লাংগলের ফলা ও লাংগল, বসতির গৃহ ও গৃহ সামগ্রী, রান্না-বান্নার হাড়ি-পাতিল, বৈরী তাপ মোকেবেলায় নানান রকমের পোষাক তৈরী ইত্যাদিতে পুর্ব হতে কম-বেশ চলা পারিবারিক শ্রমের গিল্ডগুলো প্রসারিত হয়ে ম্যানুফ্যাখচারিং শিল্পের রূপ লাভ করলে তাতে পারিবারিক শ্রম আর যথেষ্ট ছিল না। ফলে,ম্যানুফ্যাখচারিং শিল্পের জন্য আবশ্যকীয় শ্রমিক জোগাড় করতে হয়েছে ভূমি নির্ভর জনগোষ্ঠী হতে । বস্তুত, কোনো দেশ বা জাতি নয় বরং পুঁজি গঠনে পণ্য উৎপন্নে মজুরের জন্ম দিয়েছে ম্যানুফ্যাখচারিং শিল্পের মালিকরাই। আবার, ম্যানুফ্যাখচারিং শিল্পে উৎপন্নকৃত পণ্যাদি বেচা-কেনার জন্য বাজার ও যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশ ও উন্নয়ন করা আবশ্যক ও অপরিহার্য হয়েছিল বটে ম্যানুফ্যাখচারিং শিল্পের মালিক ও ব্যবসায়ী তথা বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্য।

ফলে, সামন্ততন্ত্রে ভূমির পরিবর্তে শিল্প হতে লাগল উৎপাদনের প্রধান উপায়। শিল্প ও বাণিজ্যের কারণে বুর্জোয়ারা হয়ে উঠল উঠতি ক্ষমতাবান শ্রেণী আর পণ্য উৎপাদনে ভূমি ক্রমাগত গুরুত্ব হারানোয় ভূমির মালিক সামন্ত অধিপতিরা যেমন হয়ে পড়ল কম ক্ষমতাবান তেমন শিল্পের কারণে ভূমিতে বাঁধা থাকা ভূমি দাস ও কৃষকেরাও শিল্প মজুরে পরিণত হল। আসলে,

পুঁজি গঠনে পণ্য উৎপন্নে মজুরী দাসদের উৎপন্নকারী হচ্ছে বুর্জোয়া শ্রেণী। তবে, ক্রমাগত অধিকতর পণ্য উৎপাদনে ও তা ভোগ-ব্যবহার এবং কেনা-বেচার সুবাদে ভূমি কেন্দ্রীক সামন্ত সমাজের কাঠামো ক্রমাগত বিধ্বস্ত ও বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। ফলে, পুঁজি গঠনে পণ্য উৎপাদনী শিল্পের কার্যকর ও যথাযথ ব্যবহারের উপযোগী নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সামন্ত সমাজের পতন হয়ে পড়েছিল এক ঐতিহাসিক অনিবার্যতা।

অতঃপর, সেই ঐতিহাসিক অনিবার্যতায় সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসস্তুপ হতে উত্থিত হল আধুনিক শিল্পের আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ যা প্রতিষ্ঠা করেছিল বিপ্লবী বুর্জোয়া শ্রেণী। বিজয়ী বিপ্লবী বুর্জোয়া শ্রেণী পরাজিত রাজাদের গিলোটিনেও গলা কাটা সহ দাস ও সামন্ত সমাজের রাজনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তে আধুনিক পুঁজিতন্ত্রী সমাজের রাজনৈতিক পদ্ধতি- একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অর্থাৎ আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য নীতি- সেকুলারিজমের নীতি চালু করে সামন্তদের মতবাদিক ও রাজনৈতিক শিক্ষা পদ্ধতির বিপরীতে পুঁজিতন্ত্রের উপযোগী ও আবশ্যকীয় মানবিক যন্ত্র উৎপন্নে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে খুবই সকীর্ণ পরিসরের পুরোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যত অচল ও গুরুত্বহীন করে ডিভাইন রাইটহোল্ডারদের চালুকৃত পুজা-অর্চনার সংস্কৃতিও অকেজোকরণে পরলৌকিকতার পরিবর্তে ইহলৌকিকতার রাজনৈতিক বোধে সমাজ পরিচালনায় নানান পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য, শুরুতে ইউরোপের কয়েকটি দেশে বুর্জোয়া

সমাজের পত্তন হয়। তন্মধ্যে, বৃটেন ছিল আধুনিক শিল্পের আদি ভূমি।

পুঁজির অস্তিত্বের শর্তদ্বয় হচ্ছে পুনোরুৎপাদন ও সঞ্চালন অর্থাৎ পুঁজিকে রক্ষা করতে হলে পুঁজিকে পুনরোৎপাদনে বিনিয়োগ করতে হয় আর বিনিয়োগকৃত পুঁজি সহ পুনরোৎপাদনে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্য তথা পুঁজি গঠন সুসম্পন্নকরণে পণ্যকে বিক্রি করতে হয়। পণ্য বিক্রি না হলে নতুন পুঁজি গঠনতো দূরের কথা বরং পণ্য উৎপন্নে বিনিয়োগকৃত পুঁজিও ফেরত আসবে না । ফলে, পুঁজিপতিও আর পুঁজিপতি থাকে না অর্থাৎ বিনিয়োগহীন অলস পুঁজি ক্রমাগত বাজারের নিয়মে নিঃশেষ হয়।

অতঃপর,পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে পুনরোৎপাদন ও সঞ্চালনে অর্থাৎ পণ্য উৎপাদন করে তা বিক্রি করে পণ্যকে টাকায় পরিণত করে আবার টাকাকে পণ্যে রূপান্তরে ইউরোপের যেসকল দেশে পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন পদ্ধতির উত্থান হয়েছিল সে সব দেশের জাতীয় সীমানায় যেমন পুঁজির অস্তিত্বের জন্য যথেষ্ট ছিল না তেমন পুঁজিতন্ত্র বিকাশে উপযুক্ত ও যথার্থ ছিল না বলেই পুঁজির গোলাম- পুঁজিপতি শ্রেণী পুঁজিতন্ত্রী অর্থনীতির বিকাশে অবিচ্ছেদ্য নীতি- উপনিবেশিকতার নীতি গ্রহণ ও অনুসরণ করে আমেরিকা আবিষ্কার করা সহ সমগ্র দুনিয়ায় পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন পদ্ধতির পত্তন করে। অতঃপর, পুঁজিতন্ত্রী অর্থনৈতিক পদ্ধতির বিকাশের জন্য জাতীয় সীমানা পর্যাপ্ত ছিল না।

তাইতো, অতীতের সমাজগুলো স্থানীয় বা জাতিয় ভিত্তিক হলেও মূলানান্তে ব্যক্তিগত সম্পত্তি তবে বেচা-কেনা ভিত্তিক অসংখ্য পণ্যের একটি বৈশ্বিক বাজার সমেত একটি বৈশ্বিক উৎপাদন পদ্ধতি-পুঁজিতন্ত্র হচ্ছে ইতিহাসে প্রথম একটি বৈশ্বিক সমাজ। তবে, পুঁজির অস্তিত্বের শর্তেই সমাজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পণ্য উৎপন্নকারী হয়ে একটি প্রাচুর্য্যময় সমাজ হওয়া সহ এটি হচ্ছে পুঁজিতন্ত্রীদের সৃষ্ট কৃত্রিম দারিদ্রতার একটি স্ববিরোধী সমাজ। তবে, অতীতের শ্রেণী বিভক্ত সমাজগুলো ছিল খুবই দরিদ্র।

কিন্তু, পুঁজিপতি শ্রেণীর বিশ্ব বিজয়ের পরে পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে বিশ্বময় বাজারের চাহিদার তুলনায় বেশী পণ্য উৎপন্ন হওয়ায় সূচনা হয় মন্দার। তাতে কোনো কোনো পুঁজিপতিকে নিজের পুঁজি হারিয়ে মজুরদের শ্রেণীতে অধঃপতনের পরিণতি ভোগতে হওয়া সহ সমাজে নানান নৈরাজ্যিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। আবার, বেচা-কেনার নিয়মে ও সুবিধায় ঋণ ব্যবস্থার উদ্ভবের ফলেও শিল্প-কল কারখানা ও বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার হয়েছে । তাতে যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি হয়েছে । নৌ, সড়ক, রেল সহ বিমান পরিসেবার ক্রমাগত উন্নতি হয়েছে। ঋণ ব্যবস্থার একটি মাধ্যম হচ্ছে শেয়ার মার্কেট । শেয়ার মার্কেটের উদ্ভবের পর শিল্প পরিচালনায় কার্যত পুঁজিপতি শ্রেণীর অপ্রয়োজনীয়তাই কেবল সামনে আনেনি বরং ব্যক্তিমালিকানার শেষ সীমা চিহ্নিত ও নিশ্চিত হয়ে সামাজিক মালিকানার ভিত্তি গড়ে উঠে তথা সম্পত্তির সামাজিক মালিকানার সূচনা হয়। কার্যত, শেয়ার মার্কেটের মাধ্যমে

পুঁজিতন্ত্রী সম্পত্তির তথা ব্যক্তিগত সম্পত্তির সীমাবদ্ধতা ও ক্ষীয়মানতা নিশ্চিত হয়ে বস্তুত পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা ও বার্ধক্য নিশ্চিত হয়।

আবার,পুঁজিতন্ত্রী সম্পত্তির কারণে সকল পুঁজিপতি সমপরিমাণ সম্পত্তির মালিক নয়। তাই, পণ্য উৎপাদন বা বেচা-কেনায় প্রত্যেক পুঁজিপতি সম পরিমাণ পুঁজি বা পুঁজিতন্ত্রী সম্পত্তি নিয়ে একই রকম সমতল ভূমিতে দাঁড়িয়ে সমান অবস্থান হতে সমানভাবে প্রতিযোগীতায় অযোগ্য বা তেমন সুযোগহীন হেতু পুঁজিতন্ত্র হচ্ছে অসম প্রতিযোগীতার একটি সমাজ। তাইতো পুঁজিতন্ত্র হচ্ছে নিশ্চিত অনিশ্চয়তার একটি অনিশ্চিত সমাজ। অতঃপর, নিশ্চিত অনিশ্চয়তার পুঁজিতন্ত্রে অসম প্রতিযোগীতার বাজারে পুঁজিপতিকে পুঁজিপতি থাকতে হলে কম দামে ভালো মানের পণ্য বিক্রি করতে হয়। কিন্তু, পণ্যের দাম কমাতে হলে পণ্য উৎপাদনে মজুরি শ্রমের অংশ কমিয়ে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার বাড়াতে হয়। কারণ, যে পণ্যে যত কম শ্রম নিষিক্ত হয় সে পণ্যের মূল্য তথা দাম তত কম হয়। তাই, পণ্যের বাজারে টিকে থাকার শর্তে পুঁজিপতি শ্রেণীকে পণ্যে শ্রমের হিস্যা কমাতে উৎপাদনের নতুন নতুন যন্ত্রপাতি তৈরী করতে হয় এবং তাতে নতুন নতুন পণ্যও উৎপন্ন হয় এবং নতুন পণ্য নতুন বাজার সৃষ্টি করে অর্থাৎ পণ্য নিজেই নিজের চাহিদা তৈরী করে। ফলে, পুঁজিতন্ত্রে ক্রমাগত চাহিদার পরিসর ও পরিধি যেমন বৃদ্ধি হয় তেমন চাহিদার পরিবর্তনও হয় দ্রুত।

অতঃপর, পুঁজিপতি শ্রেণীর টিকে থাকার শর্ত হচ্ছে উৎপাদন ও বিনিময়ের যন্ত্রপাতি বা হাতিয়ারাদির বিরতিহীন বৈপ্লবীকরণ

যাতে উৎপাদনের পূর্বেকার হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতি পুরোনো হওয়ার আগেই তা বাতিল হয়ে পড়ে নতুন নতুন হাতিয়ারের উদ্ভাবনের কারণে। তাতে, নতুন নতুন পণ্যও উৎপন্ন হতে থাকে ফলে, আধুনিক শিল্প আরো অত্যাধুনিক শিল্পে পরিণতি প্রাপ্ত হয়ে যেসকল নতুন নতুন পণ্য উৎপন্ন করে তা পূর্বে ছিল কল্পনার অতীত। সঞ্চালনের শর্তে ও স্বার্থে অত্যাধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থাও গড়া ও বিকশিত করতে হয় পুঁজিপতি শ্রেণীকে। তারই ধারাবাহিকতায় আজকের আইসিটির সূচনা ও বিকাশ হয়েছে। পুঁজিতন্ত্রে পণ্য উৎপন্ন ও বিনিময়ের যতো বেশী নতুন নতুন যন্ত্রপাতি বা উপায়াদি তৈরী হয় ততো বেশী পণ্য তথা সস্তা পণ্যও উৎপন্ন হয়। কারণ, পণ্য উৎপাদনে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে পণ্যে মজুরি শ্রমের হিস্যা যতোটা কমানো যায় ততোটা পণ্য মূল্য কমে এবং পণ্য উৎপাদনের পরিমাণও বাড়ে বটে তুলনামূলক কম সময়ে। কিন্তু, বিশ্ববাজারের চাহিদার তুলনায় পণ্য উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়তে থাকে বলে পুঁজিতন্ত্রের অনিরাময়যোগ্য তবে অপরিহারযোগ্য ব্যাধি- মন্দা দেখা দেয়। মার্কস যথার্থভাবে চিহ্নিত করেছেন যে, *পুঁজিতন্ত্রী মালিকানার বিরুদ্ধে পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদনের হাতিয়ারাদির বিদ্রোহ হচ্ছে মন্দা।* মন্দায় বাজার ভরা থাকে পণ্য সামগ্রীতে অথচ, পণ্য ক্রয়ে ক্রেতার অভাব। কারণ, মন্দায় , মজুরেরাও চাকুরি হারায় আর পুঁজিপতিদের কেহ কেহ দেওউলিয়া হয় বলে মন্দাকালে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমাগত কমতে থাকে। মন্দার ফল হচ্ছে ব্যক্তিগত মালিকানার সংকোচন আর সামাজিক মালিকানার পথ প্রসস্তকরণ। অতঃপর, পুনঃপুন মন্দার পরিণতি হচ্ছে

কমিউনিজম- সমানদের একটি বৈজ্ঞানিক সমাজ, যার ভিত্তি হচ্ছে সামাজিক সম্পত্তি তাই, কমিউনিজম মুক্ত বটে পণ্য, বেচা-কেনা, মজুরি দাসত্ব, শোষণ, পুঁজি, শ্রেণী ও শ্রেণী শাসন হতে। সুতরাং, পুঁজিতন্ত্রের ঐতিহাসিক পরিণতি হচ্ছে কমিউনিজম ঠিক যে নিয়মে দাসতন্ত্র হতে জন্ম নিয়েছিল সামন্ততন্ত্র আর সামন্ততন্ত্র হতে উত্থিত হয়েছিল পুঁজিতন্ত্র ঠিক সেই নিয়ম ও কারণেই। অর্থাৎ, পুরোনো সমাজের মধ্যে তৈরীকৃত উৎপাদনের নতুন নতুন হাতিয়ার যার সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহার পুরোনো সমাজে সম্ভব হয় না। তাই , পুরোনো সমাজের মধ্যে উৎপন্ন উৎপাদনের নতুন নতুন উপায়াদির যথাযথভাবে ব্যবহারোপযোগী নতুন সমাজ তৈরী করতেই হয়েছিল।

সুতরাং, দাস সমাজের রাজারা যেমন সমাজ গঠন, পরিবর্তন বা পরিচালনায় তথাকথিত অসাধারণ ব্যক্তিকে দায়-দায়িত্ব দিয়ে নিজেদেরকে অতিমানবিক বা অসাধারণ ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত ও গ্রাহ্যতা দিয়েছে তা যে সত্য নয় তাতো প্রমাণ করে সেই দাস ও সামন্ত সমাজকে টিকিয়ে রেখে কথিত অসাধারণ ব্যক্তিদের "অসাধারণ" থাকার শত চেষ্টা সত্ত্বেও দাস বা সামন্ত সমাজ এখন টিকে না থেকে ইতিহাসের অংশ হওয়ায়। প্রকৃতপক্ষে কোনো সমাজই কারো মস্তিষ্কপ্রসূত বা পরিকল্পনা মতো তৈরী কোনো বিষয় নয় বরং প্রতিটি ব্যক্তির কাজ বা পেশা নির্ধারিত হয় সমাজের বিদ্যমান শর্তাদি দ্বারা।

বিজ্ঞানীরাও দাসোচিতবোধে বিশেষ প্রতিভাবান বা মেধাবী হিসাবে এখনো গণ্য হলেও কার্যত, ২৩ জোড়া ক্রোমোজম হতে জন্মলাভকারী মনুষ্য প্রজাতির সদস্য বৈ বিজ্ঞানীরাও

অসাধারণ কেউ নয় এবং তাদের আবিষ্কারগুলোর কোনোটিও কেবলই কোনো একজন কথিত বিশেষ মেধার ব্যক্তিবিশেষের আবিষ্কার নয় বরং *পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে এবং পুঁজিপতি শ্রেণীর টিকে থাকার শর্তাদিতে আবিষ্কৃত কোনো একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়ে উঠে আরেকটি আবিষ্কারের ভিত্তি।*

অর্থাৎ, যে কোনো একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সুচনা করে বা দুয়ার খুলে দেয় আরো নতুন নতুন আবিষ্কারের। পণ্য পরিবহন সহজতর ও দ্রুততর করার জন্য আবিষ্কৃত বাস্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের পরেইতো মোটর যান, রেল ও বিমান ইতাদি আবিষ্কৃত হয়েছে। বিদ্যুৎ আবিষ্কার না হলে কি এখনকার আইসিটির সূচনা ও বিকাশ হত? তাছাড়া, আধুনিক পুঁজিতন্ত্রের পূর্বেওতো অনেক মানুষ জন্মলাভ ও মৃত্যুবরণ করল কিন্ত কেন কেহ পানির কোড আবিষ্কার করতে পারেনি পুঁজিতন্ত্রের পূর্বে অথবা, পনির কোড আবিষ্কারক- হেনরী কেভেনডিশ (১৭৩১-১৮১০) কেন অক্সিজেন (১৭৭৮) ও হাইড্রোজেন (১৭৮৩) আবিষ্কারক এন্টোনিয়েন লেভোজিয়ের (১৭৪৩-১৭৯৪)পূর্বে পানির কোড (১৮০৫) - এইছ টুও অর্থাৎ পানি হচ্ছে দুই ভাগ অক্সিজেন ও ১ ভাগ হাইড্রোজেনের সম্মিলিন এমন সূত্রায়ন করতে পারেনি? সেল আবিষ্কার ও ১৮৩৯ সালে সেল তত্ত্ব সূত্রায়িত হওয়ার পূর্বে কেন কেহ প্রাণের উৎপত্তির তত্ত্ব সূত্রায়িত করেনি বলে ১৮৫৯ সালে ডারউইনকে প্রজাতির উৎপত্তি বিষয়ক পুস্তক প্রকাশ করতে হল? অথবা, বিলিয়ন বিলিয়ন সেলের সমষ্টি হার্ট যে দেহের রেসপ্যাইরটরী সিষ্টেম সচল রাখতে রক্ত পরিবহনে একটি পাম্পিং অর্গাণ বৈ চিন্তা

করার কোনে অংগ নয় তা কেন পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের উদ্ভাবিত আধুনিক বিজ্ঞানের এনাটমি শাখার ক্রমবিকাশের আগে কেহ বলতে পারল না? উল্লেখ্য, প্রাণী দেহ হচ্ছে অনেক অনেক সেলের একটি সংমিশ্রণ। প্রত্যেকটি সেল হচ্ছে একটি সচল, স্বক্রিয় ও পুনঃর্নবীকৃত বা প্রতিলিপিকৃত প্রাণ যা নিস্প্রাণ পদার্থ হতে উদ্ভূত হয়েছে। সিংগেল সেলের প্রাণী-এমিবা হচ্ছে পৃথিবীতে সৃষ্ট প্রথম প্রাণী এসব কথাও জানতে পেরেছে পুঁজিতন্ত্রের বিজ্ঞানী বৈ আগের কোনো বিশেষ প্রতিভাবান নয়? অথবা, জীবানু অস্ত্র কেন আবিষ্কার করতে পারল না "গ্রেট" আলেকজান্ডার বা যুদ্ধবাজ চ্যাংগিস খান বা জুলিয়াস সিজার বা রাবন বধকারী রাম-লক্ষণ ভাতৃদ্বয় বা মামাকে হত্যা করে সিংহসান দখলকারী শ্রী কৃষ্ণ বা অট্টোমান স্ম্রাট সুলেমান?

মন্দায় পড়ে পুঁজিপতি শ্রেণী দুই দুইটি বিশ্ব যুদ্ধ করে অসংখ্য মানুষ খুন করে নিজেদের কলকারাখানা সহ বহু সম্পত্তি ধ্বংস করেছে। আর যুদ্ধ করার জন্য কেবল সেনা সংখ্যা বৃদ্ধি নয় এখনো পুঁজির রক্ষক -শাসকেরা মারাত্মক ধরণের মারণাস্ত্র তৈরীতে লাগাতর গবেষণা করছে এবং নতুন নতুন গণবিধ্বংসী অস্ত্র তৈরী করছে। এছাড়াও, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে পুঁজিতন্ত্রী সম্পত্তিকে পাহারা ও নিরাপত্তা দিতে নানান ধরণের স্বশস্ত্র বাহিনী লালন-পালন করছে। সেজন্য বুর্জোয়া সমাজের বিকাশে প্রগতিশীল বুর্জোয়া শ্রেণী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা-গণতন্ত্র যার আবার অবিচ্ছেদ্য নীতি হচ্ছে স্যাকুলারিজম বা ইহলৌকিকতা সেসবের কোনো তোয়াক্কা না করে হালের প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেণী নানান ফ্যাসিবাদী নীতি অনুশীলন

করা সহ নানান কালা-কানুন তৈরী ও কার্যকর করছে ভয়ানক শাস্তি দিতে যাতে কেহ তার মতামত বিনা বাধায় প্রকাশ বা প্রচার করতে না পারে।

অতঃপর, আদিম, দাস ও সামন্ত সমাজের সাথে তুলনায়ও অযোগ্য আধুনিক পুঁজিতন্ত্র মারাত্মক গণবিধ্বংসী অস্ত্রপাতি সমেত যতো রকমের যতো বাহিনী তৈরী করে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে অকার্যকর করে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেণী একদিকে রাষ্ট্রের সংখ্যা বাড়িয়েছে আরেক দিকে আইএমএফ সহ নানান বৈশ্বিক সংস্থার নিয়ন্ত্রণে ডিফাংক্ট রাষ্ট্রগুলোর স্বৈরতান্ত্রিক চরিত্র সমেত রাষ্ট্রগুলোর শাসকেরা যে একচ্ছত্র স্বেচ্ছাচারিতা করছে এবং যখন-তখন যাকে মনে করছে তাকে এমনকি বিনা বিচারে হত্যা করছে এমনকি ড্রোণ ব্যবহার করেও। অতঃপর, এই অসম প্রতিযোগিতার তবে নিশ্চিত অনিশ্চয়তার মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্রে কেহই কি নিরাপদ এবং সুরক্ষিত?

যুদ্ধ সহ এমন একটি হিংসাত্মক ও চরমভাবে শৃংখলিত পুঁজিতন্ত্রে কারো কি স্বাধীন বা মুক্ত থাকার কোনো সুযোগ আছে? তাছাড়া, খোদ পুঁজিপতিরাও পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে যেমন পুঁজির গোলাম তেমন যুদ্ধের মতো ধ্বংসাত্মক ও ক্ষতিকর ক্রিয়ায় যুক্ত ও জড়িত হতে না চাইলেও পুঁজিপতি শ্রেণী হিসাবে টিকে থাকতে পুজিপতিরা যুদ্ধ সহ বিনা বিচারেও মানুষ হত্যা, খুন, গুম ইত্যাদি যেসব হিংসাত্মক কার্যাকলাপ করছে তাতে পুঁজিতন্ত্রের শাসক শ্রেণীও কি নিজের পচ্ছন্দ মতো কিছু করতে পারছে না কি পুঁজিতন্ত্রের নিয়মাদি মেনে চলতে হচ্ছে? আর মজুরী দাসেরা তো কেবল শোষিতই নয়

বরং পুঁজিতান্ত্রিক নিয়মে কেবলই পুঁজিপতিদের পুঁজি বাড়াতে নানান দুর্ভোগ ও দুরাবস্থার শিকার হিসাবে নিজেদের জীবন নিঃস্ব ও নিঃশেষ করে মৃত্যুর জন্য দিনাতিপাত করতে হচ্ছে। আধুনিক পুঁজিতন্ত্রে শূদ্র হচ্ছে মুজরি দাসেরা। তবে, মজুরি দাসেরা পুঁজিপতি বিশেষের সরাসরি ও সার্বক্ষণিক নিয়ন্ত্রণে থাকতে হচ্ছে না।তবু,মজুরির শর্তে বন্দী বটে পুঁজিতন্ত্রের মজুরি দাসেরা।

অতঃপর, না দাসতন্ত্রে, না সামন্ততন্ত্রে বা না আধুনিক পুঁজিতন্ত্রে তথা শোষণমূলক ও শ্রেণী বিভক্ত কোনো সমাজেই কারো স্বাধীন ও মুক্তভাবে জীবন যাপন করার সুযোগ ছিল না এবং নাই। উল্লেখ্য, হাল আমলের সর্বাধিক ক্ষমতাধর শাসকও যেমন রাষ্ট্রীয় প্রটোকল ও নিয়মনীতির অধীনে সেবা করার চেষ্টা করছে পুঁজিতন্ত্রী স্বার্থের তেমন মুজরেরাও পুঁজিতন্ত্রী বিশ্ব বাজারের নিয়মের অধীন বলেই কার্যত আধুনিক শিল্পের পুঁজিতন্ত্রেও কেহই নয় স্বাধীন ও মুক্ত। অর্থাৎ পুঁজিতন্ত্রেও মানুষ বন্দী বটে পুঁজিতন্ত্রী সমাজের অসংখ্য শিকলে তাই, স্বধীন নয় বরং পুঁজিতন্ত্রের ব্যক্তিরাও পরাধীন।

সাবেকী শাসকদের পরাজিত করতে নানান যুদ্ধ সহ নানান নোংরা কৌশলেও বিশ্ব ব্যাপী পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তনে বুর্জোয়া শ্রেণী বিপ্লবী ভুমিকা পালন করলেও পুঁজিতন্ত্রী বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দুনিয়াব্যাপী পুঁজিপতিও জন্ম নেয়। কিন্তু, বিশ্ব জয়ী কলোনিয়াল শাসকদের শাসনে কলোনীর পুঁজিপতিরা তেমন রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা না পাওয়া এবং বৈশ্বিক বাজারে প্রতিযোগীতার সুযোগ না পাওয়ায় কলোনীস্থ

তথা নেটিভ পুঁজিপতিদের সাথে কলোনিয়াল শাসকদের বিরোধ হয়ে উঠে অনিবার্য। অতঃপর, নেটিভ পুঁজিপতিরা কলোনিয়াল শাসকদের তাড়িয়ে নিজেদের একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য তথাকথিত জাতীয় মুক্তির রাজনীতির সূচনা করে নেটিভ পুঁজিপতিদের সংকীর্ণ স্বার্থে। ফলে, কলোনীগুলোতে প্রতিষ্ঠিত হয় কথিত জাতীয় মুক্তির রাজনৈতিক দল।

উল্লেখ্য, দাস বা সামন্ত সমাজের ডিভাইন রাইটহোল্ডার- এক ব্যক্তির একক শাসনের পরিবর্তে নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত কতিপয়ের শাসন তথা গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতির আবশ্যক ছিল বটে পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন পদ্ধতির উন্নয়ন ও বিকাশে। তাই, পুঁজিতন্ত্রী স্বার্থে গড়ে উঠে রাজনৈতিক দল। পৃথিবীর সর্বাধিক পুরনো ৯ টি রাজনৈতিক দল হচ্ছে-

(১)যুক্তরাজ্যের হুইগ পার্টি- ১৬৭৮ খ্রীঃ।

(২) যুক্তরাজ্যের টরি পার্টি-১৬৭৮ খ্রীঃ।

(৩)যুক্ত রাষ্ট্রের ফেডারেল পার্টি- ১৭৮৯ খ্রীঃ।

(৪)যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক পার্টি-১৭৯৪ খ্রীঃ।

(৫) যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্রেটি পার্টি- ১৮২৮ খ্রীঃ।

(৬) যুক্তরাষ্ট্রের নিউ রিপাবলিক পার্টি- ১৮২৮খ্রীঃ।

(৭) যুক্তরাষ্ট্রের এন্টি- মেসোনিক পার্টি-১৮২৮ খ্রীঃ।

(৮) যুক্তরাষ্ট্রের হুইগ পার্টি- ১৮৩৪ খ্রীঃ।

(৯) যুক্তরাজ্যেও কনজারভেটিভ পার্টি-১৮৩৪ খ্রীঃ।

ইসলামী কোনো দলতো নয়ই এমনকি হাল আমলেও সৌদি, কাতার, বাহরাইন, ওমান ইত্যকার কিছু দেশে কোনো রাজনৈতিক দল না থাকলেও বাকী দুনিয়ায় এখন বহু রাজনৈতিক দল পুঁজিতন্ত্রী স্বার্থের সেবা করছে। এমনকি, পুঁজিতন্ত্র বিরোধী বলে দাবীদার লেনিনবাদী দলগুলোও ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিতন্ত্রকে সংরক্ষায় কমিউনিজমের নামাবলী গায়ে দিয়ে মজুরদেরকে বিভ্রান্ত করছে।

উল্লেখ্য,বয়োবৃদ্ধ পুঁজিতন্ত্রের প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণী পুঁজিতন্ত্রকে রক্ষা করতে কমিউনিজম বিষয়ে বিভ্রান্তি ছড়াতে রাজনৈতিক দলগুলো পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করত এই বলে যে প্রতিপক্ষ দলগুলো হচ্ছে কমিউনিস্ট দল। কমিউনিস্ট ইস্তেহারের শুরুর দিকে এমনটা বিবৃত হয়েছে। কিন্তু, গত শতাব্দির শুরুর দিক হতে বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদেরকে কমিউনিস্ট পার্টি বা সমাজতান্ত্রিক পার্টি দাবী করার প্রতিযোগীতায় লিপ্ত হয়েছে সেই একই কারণে অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিজম বিষয়ে মজুরদেরকে বিভ্রান্ত করে ক্ষীয়মান তথা মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্রকে রক্ষা করতে। তবে, হালের মুক্তবাজার অর্থনীতির পুঁজিতন্ত্রী বিশ্বায়নের রাজনীতির হেতুবাদে কথিত জাতীয় মুক্তির অর্থনীতি ও ব্যর্থ রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের লেনিনবাদ নিজের উপযোগীতা হারিয়েছে হালের পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বায়নের রাজনীতির কারণে।

লেনিনবাদী একদলীয় স্বৈরতন্ত্রী শাসনের চীন, ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়া, কিউবা ইত্যাদি এখনো তথা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইহার প্রভাবভুক্ত কথিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর পতন হওয়ার

পরও সমাজতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিষয়ে ভয়ানকভাবে নানান মিথ্যাচার করে ভুয়াভাবে দাবী করছে যে উল্লেখিত রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলো নাকি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র! অতঃপর, লেনিনবাদী, মাও পন্থী, গণতন্ত্রী, রাজতন্ত্রী, মনু পন্থী ইত্যকার সকল রাজনৈতিক দলের দলীয় বোধে শৃংখলিত বটে দলের নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা। ফলে, পুঁজিতন্ত্রীদের সৃষ্ট রাজনৈতিক দলের অধীনস্তরা সহ এসকল দলের শাসন ও প্রভাবাধীনে বন্দী তথা পরাধীন বটে পুঁজিতন্ত্রী সমাজে পুঁজিপতিশ্রেণীর মুখোমুখি থাকা শ্রমিক শ্রেণীর অগুণতি সদস্য সহ সমাজের প্রায় নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ট ব্যক্তিগণ।

পুঁজিতন্ত্রে মজুরির বিনিময়ে পুঁজি উৎপন্ন করে মজুরি দাসেরা কিন্তু পুঁজির মালিক বটে পুঁজিপতি। তাই, পুঁজিপতি শ্রেণী হচ্ছে শোষক শ্রেণী আর পুঁজি গঠনে পণ্য উৎপন্নকারী মজুরেরা হচ্ছে শোষিত শ্রেণী। পুঁজির জন্ম শর্তে শোষক পুঁজিপতি শ্রেণী ও শোষিত মজুর শ্রেণীর সম্পর্ক হচ্ছে বৈরীতামূলক। তাই, শোষক পুঁজিপতি শ্রেণী ও শোষিত মজুর শ্রেণীর মধ্যে বিরতিহীন বিরোধ হচ্ছে একটি স্বাভাবিক বিষয়। অতঃপর, পুঁজিপতি শ্রেণী ও মজুর শ্রেণীর বিরোধের ফল হচ্ছে কমিউনিজম- সমানদের একটা বৈজ্ঞানিক সমাজ।

অতঃপর, কমিউনিজম হচ্ছে পণ্যহীন, বেচা-কেনাহীন, মজুরি দাসত্ব মুক্ত , শোষণহীন, শ্রেণীহীন এবং মানুষ কর্তৃক মানুষের শাসনহীন,একটি মানবিক সমাজ। তাই, শ্রেণী বিভক্ত সমাজের বেসিক ইউনিট পরিবার নয় বরং ব্যক্তি হচ্ছে কমিউনিস্ট সমাজের বেসিক ইউনিট। ফলে, কমিউনিস্ট সমাজে প্রত্যেক

ব্যক্তিই স্বাধীন ও মুক্ত মানুষ আর শিশুদের দায়িত্ব পুরো সমাজের। সুতরাং, কমিউনজম হচ্ছে রাজনীতি ও রাষ্ট্রসমেত সকল রাজনৈতিক সংগঠন মুক্ত একটি অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক সমাজ হেতু কমিউনিজমে প্রত্যেকেই বিজ্ঞানী । অতঃপর, বিজ্ঞান বৈ কোনো পৌরাণিক কাহানী বা পূর্বেকার সকল শোষণ মূলক ও শ্রেণী বিভক্ত সমাজের শাসকদের সৃজিত সকল মতাদর্শ বা আদর্শবাদ বা দর্শন ইত্যকার কিছুরই কোনো উপযোগীতা থাকছে না কমিউনিজমে ।

দাস সমাজের শাসকদের রাজনৈতিক বোধে ওরা কেবল অসাধারণ নয় বরং বিশেষ ব্যক্তিও বটে । তাদের জন্ম যেমন বিশেষ কারণে আবার মৃত্যুর পরেও তারা জীবিতের ভাল-মন্দ দেখভাল করে থাকে। সেকারণে শাসকদের বিশেষত্ব বহাল রাখতে দাস সমাজের শাসকেরা তাদের জন্ম-মৃত্যু নিয়েও নানান কল্পকথা তৈরী করে তাদেরকে চিরস্মরণীয় করতে তাদের জন্মদিবস ও মৃত্যুদিবস উদযাপনের রীতি চালু করে মৃত্যুর পরেও ওরা প্রভাব বিস্তারক থেকে যওয়ার বিহীত করে স্বীয় উত্তরাধিকারদের রাজকীয় কর্তত্ব নিশ্চিত করার মাধ্যমে ব্যক্তিগত সম্পত্তিবানদের পরজীবিতার স্বার্থকে বহাল রাখার বিহীতাদিকরণে বস্তগত তথা লৌকিক জীবনের সফলতার জন্য মৃত ব্যক্তি, অলৌকিক ক্ষমতা তথা কাল্পনিক শক্তির কৃপা ধন্য হওয়ার নানান রীতি-নীতি ও সংস্কৃতি চালু করেছে দাসসমাজের শাসকেরা।

তাইতো জন্ম-মৃত্যু বার্ষিকী বা নব বর্ষ উদযাপন বা কোনো রাজনীতিকের কোনো জয় বা সফলতার দিবস পালন ইত্যকার

বিষয়াদিসহ শোষকদের সৃষ্ট ও বহালকৃত মানুষে মানুষে বিভেদ- বৈষম্যে সহায়ক বোধ, রীতি-নীতি, প্রথা- ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ইত্যকার কোনো বিষয় কমিউনিজমে থাকার কোনো অবকাশ নাই।

ফলে, খুন খারাবি, ধর্ষণ, লুন্ঠন, মিথ্যাচার, প্রতারণা ইত্যকার ভয়ংকর বিষয়গুলো কেবলই অতীতের বিষয় নয় বরং টোটালি অজ্ঞাত হয়ে যাবে কমিউনিজমে। আইন, অপরাধ, দন্ড ইত্যকার বিষয়গুলোর উপযোগীতাহীনতায় এগুলোরও কিছুই থাকবে না একটি পরিপূর্ণ মানবিক বোধ সম্পন্ন একটি একক ও অখন্ড মানবজাতির মানবিক সমাজ- কমিউনিজমে। তাইতো,সেনা সহ কোনো স্বশস্ত্র বাহিনীর কোনো উপযোগীতা থাকছে না বিধায় কমিউনিজমে যুদ্ধাস্ত্র ও যোদ্ধা বাহিনীর ঠাঁই হবে ইতিহাসের যাদুঘরে। ফলে, প্রতিযোগীতামুক্ত তবে সহযোগীতা ভিত্তিক কমিউনিজমে সকল মানুষ বাস করবে বটে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি, ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের পরিবেশে।

কমিউনিজমে সকল সক্ষম ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপন্ন করবে তাদের সক্ষমতার সর্বাধিক ব্যবহার করে কিন্তু সমাজের প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রয়োজনীয় সামগ্রী সমাজের তহবিল হতে গ্রহণ করবে। সামাজিক উৎপাদন ও তথ্য যোগাযোগে ও সমন্বয়ে দুনিয়ার সকলের একটি সামাজিক সংগঠন সহ কমিউনিস্ট সমাজ কাজ করবে বটে সমাজের সকলের অধিকতর কল্যাণে প্রকৃতিকে সর্বাধিক কাজে লাগাতে প্রকৃতি বিজয়ে। অতঃপর, কমিউনিজমে প্রত্যেকে হচ্ছে স্বাধীন ও মুক্ত মানুষ । অর্থাৎ মানুষের শোষণ-

শাসন মুক্ত কমিউনিজমে কোনো মানুষ কোনো মানুষকে কোনো কিছু করা বা না করার হুকুমনির্দেশ করার সুযোগহীন।

পুঁজির অস্তিত্বের শর্তাদিতে এবং পুঁজিপতি শ্রেণীর টিকে থাকার শর্ত সমূহের হেতুবাদে প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতিশ্রেণী কর্তৃক চাপিয়ে দেওয়া একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে একাকী শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক অর্জিত হবে পরিপূর্ণ মানবিক বোধ ও সমতার নীতির এক ও অখন্ড মানব জাতির সমাজ-কমিউনিজমেই অর্জিত হবে প্রত্যেকের স্বাধীনতা ও মুক্তি। তদ্বিষয়ে কমিউনিস্ট ইস্তেহারে বর্ণিত হয়েছে এইঃ- " ইহার শ্রেণীগুলি ও শ্রেণী বৈরীতা সহ পুরনো বুর্জোয়া সমাজের স্থলে আমরা পাব একটা সমিতি যাতে প্রত্যেকের স্বাধীন বিকাশের শর্ত হচ্ছে সকলের স্বাধীন বিকাশ।" চ্যাপ্টর-০২, পৃষ্ঠা -৫৩, ইসফরমেশন সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত। @ www.icwfreedom.org

উল্লেখ্য, পুঁজির অস্থিত্বের শর্তাবলী ও পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণীর টিকে থাকার শর্তাধীনে সৃষ্ট পুনঃপুন মন্দা হতে উদ্ভূত চরম নৈরাজ্যিক সামাজিক পরিস্থিতিতে বহুভাগে বিভক্ত সমাজ শাসনে অক্ষম তবে ভয়ানক হিংস্র পুঁজিপতি শ্রেণীর চাপিয়ে দেওয়া তবে একাকী শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে খুবই বিশ্রী ও ভয়ানক মন্দ পুঁজিতন্ত্রী সমাজ বিলুপ্ত হবে আর উত্থান বা পত্তন হবে কমিউনিজমের। কিন্তু, পুঁজিতন্ত্র যেহেতু একটি বৈশ্বিক সমাজ সেহেতু বৈশ্বিক পুঁজিতন্ত্রকে কোনো একক দেশে বিলুপ্ত করে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। তাইতো, পুঁজির কোড ও সমাজ পরিবর্তনের কোড আবিষ্কারের মাধ্যমে

কমিউনিজমের বিজ্ঞান আবিষ্কারকারী মার্কস এবং তা ব্যাখ্যাকারী এ্যাংগেলস যথার্থভাবে সুত্রায়ন করেছেন যে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির প্রথম শর্ত হচ্ছে দুনিয়ার শ্রমিকদের একতা।

আবার, পুরো সমাজকে মুক্ত না করে শ্রমিক শ্রেণী তার মুক্তি অর্জন করতে পারবে না। তাই একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিতন্ত্রকে বিলুপ্ত করে সামাজিক মালিকানার কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠা করে কার্যত পুঁজিতন্ত্রের সকল ব্যক্তিকে স্বাধীন ও মুক্ত করবে বটে একাকী শ্রমিক শ্রেণী নিজ শ্রেণী মুক্তির স্বার্থে ও শর্তে। অতঃপর, রাজনীতিকদের মতো শ্রমিক শ্রেণী দাবী করবে না যে তারা হচ্ছে মানব দরদী বা জনসেবক বরং শোষিত -শাসিত মজুর শ্রেণী নিজের মুক্তি হাসিল করবে নিজ শ্রেণী স্বার্থে। আর শ্রমিক শ্রেণী স্বীয় শ্রেণী মুক্তি সাধনে পুঁজিতন্ত্রী সম্পত্তি বিলুপ্ত করার হেতুবাদে পুঁজিপতি শ্রেণীও আর পুঁজিপতি শ্রেণী হিসাবে টিকে থাকার সুযোগ নাই।তাইতো, কমিউনিজমে মজুরি দাস তথা শ্রমিক শ্রেণীও নাই। ফলে, কমিউজিমে সকলেই মানুষ ,মানবিক মানুষ এবং পরিপূর্ণ মানবিক বোধ সম্পন্ন মানুষ। আর কমিউনিজম সমানদের একটি বৈজ্ঞানিক সমাজ বলেই সকলেই বিজ্ঞানী বৈ কমিউনিজমে রাজনীতিক নাই একজনও আর আদর্শবাদী বা মতাদর্শী বা দার্শনিক বা গুরু, বা নেতা, বা বীর, বা গাইড বা কর্তা বা এধরণের কোনো পরজীবী বা পরজীবিতার সেবক বা সহায়ক থাকার সুযোগ নাই কমিউনিজমে। সুতরাং, একাকী শ্রমিক শ্রেণীর একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের ফলে প্রতিষ্ঠিত নতুন সমাজ-কমিউনিজমে সকলেই হবে স্বাধীন ও মুক্ত মানুষ।

তাইতো, পুঁজিতন্ত্র হচ্ছে শেষ ও চূড়ান্ত শোষণমূলক ও শ্রেণীবিভক্ত সমাজ অর্থাৎ মানুষের নিকট মানুষের অধীনতা তথা পরাধীনতার শেষ সমাজ।

উল্লেখ্য, স্বাধীনতা ও মুক্তি ছাড়াতো গৃহপালিত পশুর মতো মানুষও বেঁচে আছে। বিলিওনিয়াররাতো বেশরমের মতো খুবই বিলাশ- বহুল জীবন যাপন করা সমেত হালের সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়েও অনেক অনেক গুণ বেশী সম্পত্তি নিজেদের দখলে রেখে দিচ্ছে। কিন্তু, তাতে পুঁজিতন্ত্রের বিলিওনিয়াররা কি নিশ্চয়তা, সুরক্ষা, নিরোদবিঘ্নতা, সুখ, স্বঃস্থি, মানবকি মর্যাদা, শান্তি ইত্যাদি সহ জীবনকে ভোগ-উপভোগ করে একটি তাৎপর্যপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারছে? মজুরদের ক্ষেত্রেতো পুঁজিতন্ত্রকে বহাল রেখে উল্লেখিতরূপ বিষয়াদি হাসিল করা কল্পনা করারও সুযোগ নাই।

অথচ, পুঁজিতন্ত্র বিলুপ্তিতে প্রতিষ্ঠিত কমিউনিজমে পুঁজিপতিরা কেবল মজুরদেরকে শোষণ করার সুযোগ হারাবে বটে কিন্তু কমিউনিজম- একটি প্রাচুর্যময়, মানব কল্যাণে সহযোগীতার ভিত্তিতে প্রকৃতি জয়ে ক্রিয়াশীল পরিপূর্ণ মানবিক বোধ সম্পন্ন একটি একক ও অখন্ড মানব জাতির বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা ময় এবং সমানদের একটি নিরবচ্ছিন্ন শান্তির বৈজ্ঞানিক সমাজ যেখানে প্রত্যেকে মুক্ত ও স্বাধীন হেতু সকলেই নিরাপদ ও সুরক্ষিত।

সুতরাং, এটা ঠিক যে খাদ্য তথা জ্বালানী অর্থাৎ শক্তি ছাড়া বাঁচা যায় না কিন্তু, স্বাধীনতা ও মুক্তি ছাড়া প্রকৃতার্থেই জীবনকে উপভোগ ও উপলব্দিও করা যায় না এবং মানবিকও হওয়া যায়

না । মানুষও পশু বটে কিন্তু মানুষের জীবন যে কেবলই পশুদের মতো নয় বা কেবলমাত্র ভোগ- সম্ভোগের জীবন নয় বরং স্বাধীনতা ও মুক্তি ছাড়া প্রকৃতি সৃষ্ট মানুষ প্রকৃতিকে জয় করে সমগ্র মানব জাতির প্রত্যেকে সকলের বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা নিয়ে অনিশ্চয়তা ও দুশ্চিন্তামুক্ত এবং চিরকালীন শান্তির চিরযৌবনের এক তাৎপর্যপূর্ণ জীবন যাপন করাও সম্ভব নয় । তাই কেবল খেয়ে পরে বেঁচে থাকার মতো সুযোগ পাওয়াকে স্বাধীনতা বিবেচনা করা হচ্ছে কেবলই গৃহ পালিত বা খাঁচায় বন্দি তবে খাদ্যের অভাবহীন পশুদের পশুসূলব জীবন যাপন বৈ মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন স্বাধীন ও মুক্ত মানুষের মুক্ত জীবনকে চিন্তায়ও না আনতে পারা।

এক বিশাল সংখ্যক শোষক-শাসক তথা পরজীবী যারা পণ্য উৎপাদন করে না পুঁজিতন্ত্রে। তবু, পুঁজিতন্ত্রেই খাদ্যও প্রচুর পরিমাণ উৎপন্ন হচ্ছে। কিন্তু, কমিউনিজমে সকল সক্ষম ব্যক্তি যখন উৎপাদন ও যোগাযোগের আরো উন্নততর ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপন্ন করবে তখনতো প্রত্যেকের উন্নত মানের জীবন যাপনে গড়ে দৈনিক ১ ঘন্টাও শ্রম করার দরকার হবে না। আর হাল আমলে খাদ্য হিসাবে মানুষ যা খাচ্ছে তাতো অতিতের বিষয়ে পরিণত হবে । তথ্য প্রাপ্তি ও যোগা-যোগ, যান-বাহন, বসতি সহ পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদির ক্ষেত্রের পরিবর্তনের বিষয়টি যদি আদিম সমাজের সাথে হালের পুঁজিতন্ত্রের তুলনা করা হয় তাহলেও কমিউনিজমে সেসব কি রকমের হবে তা

মোটাদাগে বুঝা বৈ সম্যকভাবে পুঁজিতন্ত্রে উপলব্দি করা যাবে না ।

অতঃপর, কেবল খেয়ে- পরে পশু সুলব জীবন যাপন নয় বরং প্রকৃতার্থেই এমনকি মৃত্যুকে ঠেকিয়ে একটি উন্নততর মানবিক জীবন-যাপনের জন্য স্বাধীনতা ও মুক্তির কোনো বিকল্প নাই। দাস বা সামন্ত সমাজ নয় তবে আধুনিক শিল্পের আধুনিক পুঁজিতন্ত্রের পণ্য উৎপাদন পদ্ধতি যেমন পণ্য উৎপাদনী প্রক্রিয়ায় সমতার বোধের সূচনা ও প্রসার করছে তেমন স্বাধীনতা ও মুক্তির চিন্তা সহ স্বাধীনতা ও মুক্তির সকল ভিত্তি ও শর্ত ক্রমাগত তৈরী করছে বটে খোদ পুঁজিতন্ত্র কেবলই পুঁজির অস্তিত্বের শর্তাদিতে এবং পুঁজিপতি শ্রেণীও তা করতে বাধ্য হচ্ছে তার নিজের টিকে থাকার জন্য। ফলে, পুঁজিপতি শ্রেণীই নিজের সংকীর্ণ শ্রেণী স্বার্থে পুঁজিতন্ত্রী সমাজ সমেত নিজের বিলুপ্তির কাজ করে যাচ্ছে বটে ইচ্ছে নিরপেক্ষভাবে কেবলই পুঁজির গোলাম বলে। পুঁজির গোলাম- পুঁজিপতি শ্রেণী সমেত পুঁজিতন্ত্রকে বিলীন করবে বটে শ্রমিক শ্রেণী। অতঃপর, সেই লক্ষ্যে তথা একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য দুনিয়ার মজুরদেরকে একতাবদ্ধ করতে গঠিত হয়েছিল কমিউনিস্ট লীগ যার ঘোষণাপত্র অর্থাৎ কমিউনিস্ট পাটির ইস্তেহার রচনা করেছিলেন মার্কস এবং এ্যাংগেলস। লীগের বিলুপ্তির পর একই হেতুবাদে ১৮৬৪ সালে গঠিত হয়েছিল প্রথম আন্তর্জাতিক। কিন্তু, ১৮৭১ সালের প্যারী কমিউনের অনিবার্য পরাজয়; পুঁজিপতি শ্রেণীর ভয়ানক রকমের দমন-পীড়ন; এবং প্রথম

আন্তর্জাতিকে নৈরাজ্যবাদীদের সৃষ্ট সংকট ও সমস্যা ইত্যকার কারণে প্রথম আন্তর্জাতিকও ১৮৭৩ সালে বিলুপ্ত হয়।
প্রথম আন্তর্জাতিকের লক্ষ্য অর্জনে গঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের লন্ডন কংগ্রেসে ১৮৯৬ সালে উপনিবেশিকতা বিরোধী কথিত জাতীয় মুক্তির রাজনীতি গ্রহণ করে কমিউনিস্ট আন্দোলন করার নীতিকে বিসর্জন দেয় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রভাবশালী মোড়লেরা। লেনিনের বলশেভিক পার্টিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বটে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সেই বিষাক্ত নীতি সমর্থন করেই। তাইতো, সারা দুনিয়ার লেনিনবাদীরা এখনো কথিত জাতীয় মুক্তির রাজনীতি করছে। কলোনিয়াল শাসকদের তাড়িয়ে নেটিভ পুঁজিতন্ত্রীদের স্বার্থে কোনো রাষ্ট্র গঠিত হলে সেটিকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে গণ্য করে সেই নতুন তবে কথিত স্বাধীন রাষ্ট্রের জনগণকে বলা হচ্ছে স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক।

কি সব ভয়ানক ও আজগুবি ছবক দিচ্ছে ওরা। স্বাধীন দেশ ? দেশ কি মানুষ যে এটির স্বাধীনভাবে চলাচল করতে বা মুক্তভাবে কোনো কিছু করা বা না করা বা তদমর্মে মুক্তভাবে চিন্তা করার স্বাধীনতা আবশ্যক? অথবা, স্বাধীন রাষ্ট্র! উল্লেখ্য, জন্মসূত্রে রাষ্ট্র নিজেই বহু শিকলের একটা বিশাল বান্ডিল। তাই, রাষ্ট্র বিশেষের বাসিন্দারা সকলেই রাষ্ট্রের শিকলে বন্দী। শোষিত ও শাসিতদেরকে রাষ্ট্রীয় শিকল পরিয়ে শোষক-শাসক শ্রেণীর পরজীবিতার সংকীর্ণ ও হীন স্বার্থ চরিতার্থকরণে ওরা তথা পরজীবীরা জন্ম দিয়েছে রাষ্ট্র যা হচ্ছে শোষিত-শাসিতদেরকে দমন-পীড়নে শোষক-শাসক শ্রেণীর সর্বাধিক

শক্তিশালী যন্ত্র। তাই, জন্মসূত্রেই রাষ্ট্র যেমন -পীড়নের যন্ত্র তেমন তা হচ্ছে শোষক -শাসক শ্রেণীর তীক্ষ্ণ ধার সম্পন্ন শ্রেণী হাতিয়ার। অতঃপর, রাষ্ট্র তা হোক আধুনিক বা দাসতান্ত্রিক বা লেনিনবাদী তাতে রাষ্ট্রের কার্যাবলী তথা দমন-পীড়ন ও নির্যাতন করার ধরণের হের-ফের হলেও কার্যত তদার্থে রাষ্ট্রের চরিত্র তথা প্রকৃতির তেমন হের-ফের হয় কি? না।

কিন্তু, নেটিভ পুঁজিপতিদের স্বার্থের রাজনৈতিক সেবকেরা কলোনিয়াল শাসকদের তাড়িয়ে নিজেরা শাসক হতে তথা রাজস্বভোগী ও রাজস্ব শিকারী হতে তথাকথিত একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের ধুয়া তুলে দেশপ্রেমের আবেগী মোহে খোদ মজুরদেরকেও বিভ্রান্ত ও মোহাচ্ছন করতে বিশেষ টনিক বা রাসায়নিক ড্রাগের চেয়ে ভয়ংকর জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ড্রাগ ছড়িয়ে দিয়ে যুবাদের মধ্যেও কার্যত অতিতের তবে পুঁজিতন্ত্রী তথা কলোনিয়াল শাসকদের দ্বারা পরাজিত ও পরাভূত শাসকদের প্রতি শ্রদ্ধা, মোহ ও প্রেম জাগিয়ে এমনকি স্বয়ংঘাতি হতেও প্ররোচিত করে আধুনিক পুঁজিতন্ত্রী সমাজকে পিছনের দিকে টানতে গিয়ে জাতীয়তাবাদের স্বঘোষিত ঠিকাদার ও কথিত দেশপ্রেমিকরা একটি ভয়ংকর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

উল্লেখ্য, বৈশ্বিক পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির হেতুবাদেই বিশ্বের সকল জাতি সর্ব দিক হতে আন্তঃনির্ভরশীল। তাই, পুঁজিতন্ত্রে কোনো জাতির মুক্তিতো দূরের বিষয় বরং পুঁজিতন্ত্র বিরোধী কমিউনিস্ট আন্দোলন তথা শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন যত শক্তিশালী হবে ততো জাতিগত বিরোধ ও বৈরীতা হ্রাস

পেতে থাকবে। চূড়ান্তভাবে, পুঁজিতন্ত্রের পতনে প্রতিষ্ঠিত কমিউনিজমে জাত-জাতি বলে কোনো গোষ্ঠীতো নয়ই এমনকি এ ধরণের শব্দগুলো অতীতের ডাস্টবিনে ঠাঁই নিবে। কারণ, মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণ ও শাসনের সুবিধার্থে মানুষদেরকে উঁচু আর নীচু জাতি বা সভ্য আর অসভ্য জাতি বা স্বজাতি ও ভিন্ন বা বৈরী জাতি ইত্যকার নানান জাতির তকমায় চিহ্নিত ও ভাগ-বিভাজন করে মানুষদের একটা অংশের সাথে আরেক অংশের বিরোধ-বিদ্বেষ ও ঘৃণা ছড়ানোর জাতীয়তার রাজনৈতিক ধারণার কোনো উপযোগীতা একটি এক ও অখন্ড মানবজাতির সমাজ কমিউনিজমে নাই। তাইতো, শাসকদের সৃজিত জাতীয়তার বোধ কেবল মুছেই যাবে না বরং তা চিরতরে বিলীন হয়ে কমিউনিজমে দুনিয়ার সকল মানুষ পরিপূর্ণ মানবিক বোধে এক অখন্ড ও অবিভক্ত মানব প্রজাতি হিসাবে প্রত্যেকের সাথে সকলের প্রেম, ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের সম্পর্কে উত্তীর্ণ হয়ে কার্যত মানুষেরা প্রথম মানুষ হবে যা অতীতে কখনো সম্ভব ছিল না।

আবার, বৈশ্বিক পুঁজিতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকারীরা তাদের পুঁজি গঠন ও রক্ষায় পণ্য বেচা-কেনার বিশ্ব বাজারের আওতায় ও বাজারের নিয়মের অধীন বলেই কোনোভাবেই দেশ বিশেষের সীমানায় বা গন্ডিতে আটকে রাখতে পারেনি নিজেদেরকে বলেইতো পুঁজিপতিরাও বৈশ্বিক বৈ দেশীয় নয় তথা দেশপ্রেমিক নয়। আর বৈশ্বিক পুঁজিতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকারী বৈশ্বিক পুঁজিপতি শ্রেণীর সৃষ্ট মজুর শ্রেণীরতো দেশ প্রেমিক হওয়ার কোনো সুযোগ রাখেনি খোদ পুঁজিপতিরাই বলেই শ্রম-শক্তি বিক্রির জন্য

মজুরেরা বিশ্ববাজারের নিয়মের অধীন বলেই দেশ-জাতি হীন মজুরদের পণ্য- মজুরদের শ্রম- শক্তি বিক্রির জন্য নানান দেশে গমণাগমন করছে। এবং অনুরূপ গমণাগমন নিশ্চিত করার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণী পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বায়নের রাজনীতি চালু ও কার্যকর করে বিশ্বময় পুঁজি ও পণ্যের অবাধ গমণাগমনের মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু ও তা পর্যায়ক্রমে পূর্ণভাবে বাস্তবায়নের জন্য বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সহ নানান বৈশ্বিক সংগঠন তৈরী করেছে।

কমিউনিস্ট ইস্তেহারেও শ্রমিকদের জাত-জাতি বা দেশ এবং মুক্তি বিষয়ে যথার্থভাবে যা বিবৃত হয়েছে তার মর্মার্থ হচ্ছে- মজুরদের কোনো জাতি ও দেশ নাই তবে পুঁজিতান্ত্রিক সম্পত্তি বিলীন করার মাধ্যমে নিজেদের শৃংখল হারিয়ে নিজেদের মুক্তি হাসিলের জন্য জয় করার মতো মজুরদের আছে একটি বিশ্ব।

অতঃপর, বিদ্যমান রাজনৈতিক সীমানা দ্বারা খন্ডিত ও বিভক্ত পৃথিবীকে জয় করার মাধ্যমে মজুর শ্রেণী দেশমুক্ত তথা রাজনৈতিক সীমানামুক্ত একটি বিশ্ব প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে একটি অখন্ড- অবিভাজিত ও একক মানব প্রজাতির প্রত্যেকের স্বাধীন ও মুক্ত জীবন হাসিল করার মাধ্যমে যে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে সেই মুক্ত সমাজের স্বাধীন ও মুক্ত জীবনের সাথে পুঁজিতন্ত্র সমেত অতীতের কোনো সমাজের জীবনই তুলনার অযোগ্য।

তবে, স্বাধীন ও মুক্ত মানুষদের মুক্ত সমাজে আনন্দময় জীবন যাপনের সুযোগ লাভ না করতে পারলেও সেই মুক্ত ও স্বাধীন

মানুষদের মুক্ত সমাজের জন্য কাজ করাটাও কিন্তু কম আনন্দের নয় বরং অমানবিক পুঁজিতন্ত্রের মধ্যে বাস করেও চরম হিংস্রতার পুঁজিতন্ত্র বিলুপ্তির কাজ করাটা একটি তাৎপর্যপূর্ণ জীবনেরই কাজ বটে। সুতরাং, মানুষ কর্তৃক মানুষের শাসনের সমাপ্তি করার মাধ্যমে স্বাধীনতা ও মুক্তি হাসিলের কাজই হচ্ছে প্রকৃত আজাদী অর্জনের প্রকৃত কাজ।

উল্লেখ্য, পুঁজিতন্ত্রী সমাজ বিকাশে উপনিবেশিকতার নীতি অপরিহার্য হলেও বয়োবৃদ্ধ পুঁজিতন্ত্রে এই নীতির উপযোগীতা বা কার্যকারিতা রহিত হয়েছে। ফলে, মন্দা এড়াতে ও বিশ্বময় পুঁজি-পণ্যে অবাধ চলাচলে তথা দুনিয়াময় মুক্ত বাজার অর্থনীতি চালু ও বহাল রাখতে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ জয়ীপক্ষ দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সমাপ্তি চুক্তিতে বৈশ্বিক পুঁজিতন্ত্রী অর্থনীতিকে একটি কেন্দ্র হতে নিয়ন্ত্রণ করতে আইএমএফ এবং দুনিয়ার সামাজিক সমস্যা তথা পুঁজিতন্ত্রী সমস্যা সমূহ পারস্পারিক আলোচনার মাধ্যমে নিরসনে জাতিসংঘ এবং পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদনের কর্মস্থলে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখতে আইএলও গঠন করা সহ আরো নানান বৈশ্বিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণী পুঁজিতন্ত্রী বিশ্বায়নের রাজনৈতিক নীতি গ্রহণ করে। ফলে, আইএমএফের সদস্য রাষ্ট্রগুলো কার্যত আই এম এফের অর্থনৈতিক নীতি বাস্তবায়নে লোকাল এজেন্টে পরিণত হয়। তাতে, রাষ্ট্রগুলোর নির্বাহীগণ এমনকি রাষ্ট্রের খরচের জন্য আয় করার রাজস্বনীতিও স্বাধীনভাবে প্রনয়ণের এখতিয়ার হারায়। অতঃপর, মজুর শ্রেণীকে দমনপীড়নে খুবই দক্ষ হওয়া সত্ত্বেও আই এম এফের

নিয়ন্ত্রণাধীন বিশ্ব অর্থনীতির রাষ্ট্রগুলো নিজের আয় রোজগারের পলিসি স্বাধীনভাবে নির্ধারণে অযোগ্য হয়ে কার্যত প্রতিটি রাষ্ট্র ডিফ্যাংক্ট রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। এবং ওদেরই মতে ন্যাশন ষ্টেট ইজ ডেড।

অতঃপর, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ জয়ীদের সিদ্ধান্তমতো কলোনিয়াল নীতির সমাপ্তি ঘটে। তাতে, কলোনিয়াল শাসকেরা স্থানীয় শাসকদের নিকট রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর করতে থাকায় দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর রাষ্ট্র সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। তাতে ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠাকালে আইএমএফের মাত্র ৫১ সদস্যের স্থলে হালে ১৯০ টি সহ পৃথিবীতে রাষ্ট্র সংখ্যা ২৩০ এর বেশী। কিন্তু, রাষ্ট্র সংখ্যা যত বেড়েছে ততবেশী বেড়েছে রাষ্ট্রের খরচ। কিন্তু, শ্রমিক শ্রেণীর উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্যের অংশ বিশেষ ছাড়াতো রাষ্ট্রের আয় আর কিছুই না । অতঃপর, দুনিয়ার সকল রাষ্ট্রের তাবৎ খরচ যোগায় বটে শ্রমিক শ্রেণী আর রাষ্ট্র তার খরচের যোগানদাতা শোষিত শ্রমিক শ্রেণীকেই দমন-পীড়ন করে মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্রকে টিকিয়ে রেখে চরম প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণীর শোষণমূলক স্বার্থ দেখ-ভাল করছে।

লেনিনবাদীরা সহ জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ফেরিওয়ালারা পুঁজিপতি শ্রেণীর টিকে থাকার জন্য পুঁজিতন্ত্রী বিশ্বায়নের রাজনীতির অনুকুল পরিবেশে কথিত স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পেয়ে এমনকি, চোট্ট ধুতি পরা, খালি পায়ের তবে আধুনিক শিল্পের মালিক টাটাদের বাড়ীতে টাটাদের অতিথী হিসাবে থেকেও দাস সমাজের পোষাক তৈরীর যন্ত্র- চরকা দিয়ে কথিত স্বদেশী শিল্পের স্বদেশী স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতির ভুয়া

খোয়াব দেখানো উপরন্ত, এমনকি ভারতের সেনা বাহিনীকে বিলুপ্ত না করে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে ভাগাভাগি করে অশান্তির যুদ্ধ বা যুদ্ধাবস্থায় বজায় ও বহাল রেখে শান্তি বিষয়েও দ্বিমুখি নীতির ব্যক্তিটিও নাকি কথিত স্বাধীনতার বীর সেনানী। উল্লেখ্য, পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে মহামন্দায় নিপতিত হয়ে দুই দুইটি বিশ্ব যুদ্ধ সংঘটিত না হলে কি পুঁজিতন্ত্রী দুনিয়াকে কলোনিয়াল পলিসি মুক্ত করার কোনো কার্যকর পদক্ষেপ কলোনিয়াল শাসকেরা নিত, নাকি কথিত স্বাধীনতা সংগ্রামীরা এত্তোগুলো ডিফ্যাংক্ট রাষ্ট্র বানাতে পারত?

উল্লেখ্য, রাষ্ট্র যারা তৈরী করে বা প্রতিষ্ঠা করে তা হোক দাসতান্ত্রিক রাষ্ট্র বা আধুনিক বৈশ্বিক পুঁজিতন্ত্রে স্বীয় অখন্ডতা রক্ষা এবং রাষ্ট্রিক কার্যাদি যথার্থভাবে সম্পাদনে সক্ষমতায় অক্ষম তথা অন্তিম দশায় উপনীত রাষ্ট্র ভেংগে বা ভাগ-বিভাগ করে তারা তা করে বটে শোষিত ও শাসিতদেরকে শোষক-শাসক কর্তৃক শোষণ-শাসন করে শ্রেণী শাসন বজায়, বহাল ও বলবত রেখে মানুষ কর্তৃক মানুষকে বন্দী ও পরাধীন রেখে রাজস্ব তথা রেভিনিউও হান্টিং ও কনজিয়ম করা সুযোগ-সুবিধা সমেত রাষ্ট্রিক কর্তৃত্বাবান ও ক্ষমতাবান হতে। তাই, যতোই তারা মুক্তি ও স্বাধীনতা বিষয়ে গল্প-গাঁথা বা বানোয়াটি কাহানী রচনা করুক না কেন কার্যত তারা কেহই যেমন স্বাধীনতা প্রত্যাশী নয় তেমন নয় তারা মুক্তিপ্রেমী। স্রেফ ভোগাস।

উল্লেখ্য, ক্ষয়িষ্ণু ও মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্রের যুগে যে বা যিনি শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিতান্ত্রিক সম্পত্তি বিলীন করে মজুরি দাসত্বের অবসান ঘটিয়ে

পণ্যমুক্ত , পুঁজিমুক্ত, শ্রেণী মুক্ত এবং শ্রেণী শাসনমুক্ত তাই বেচা-কেনা মুক্ত ফলে শোষণ-শাসন মুক্ত হেতু আইন, রাজনীতি, মতাদর্শ, দর্শন, অপরাধ, সাজা ইত্যাদি হতে মুক্ত বিজ্ঞানী ও সমানদের একটি বৈজ্ঞানিক সমাজ তথা মানুষে মানুষে ভেদা-ভেদহীন ও বৈষমহীন একটি অবিভক্ত, অখন্ড ও একক মানব প্রজাতির প্রত্যেকের মুক্ত ও স্বাধীন সমাজ প্রতিষ্ঠার পক্ষে নয় বা সে লক্ষ্যে যে বা যিনি কাজ করে না সে বা তিনি স্বাধীনতাকামী ও মুক্তি প্রেমী হওয়ার যোগ্য হওয়ার এখনো উপযুক্ত নয়।

কথিত স্বাধীন ভারত অর্জনের নামে কেবল ভারতের মজুরদেরকেও বিভ্রান্ত ও বিভক্ত করা নয় বরং ভারতকে ভাগ করার রাজনীতির অনুশীলন করে তখনকার রাজনীতির কুশিলবরা দাঙগা লাগিয়ে কত সংখ্যক মানুষকে হত্যা, জখম ও বাস্তুচ্যুত তথা উদ্বাস্তু করেছিল তার কি ইয়াত্তা আছে? জীবন্ত মানুষেরা হিজরত করতে উঠেছিল ট্রেনে কিন্ত গন্তব্যে পৌঁছল ট্রেনটি লাশের চালান নিয়ে। আর ধর্ষণ, লুট-পাট, দখল-বেদখল ও জবরদখলের সংখ্যা কি রাজনীতিকেরা হিসাব করেছিল? তবে, যে বৃটিশ কলোনিয়াল শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার গৌরবগাঁথা কথিত স্বাধীনতা সংগ্রামিরা রচনা করেছে তারা কি কখনো নিশ্চিত করেছে যে ভারতের কথিত আন্দোলনে মোট কত সংখ্যক বৃটিশ শাসক নিহত হয়েছে?অথবা হতাহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের সংখ্যাটি কি ভারতীয়দের চেয়ে কলোনিয়াল শাসকদের বেশী?

উল্লেখ্য, ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠা ও তা রক্ষণা-বেক্ষণ বা ব্যক্তিগত মালিকানা হতে উদ্ভূত সমস্যা- সংকট ও বিরোধ-বৈরীতায় এ পর্যন্ত যত মানুষ খুন, আহত, বন্দী, ধর্ষিত, নিগৃহীত, অত্যাচারিত হয়েছে তার কি কোনো পরিসংখ্যান কোনো রাজনীতিক বা শাসক দিতে চেয়েছে না দিবে? প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও মহামারিতে হতাহত ব্যক্তির সংখ্যা বেশী হবে, নাকি সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা জনিত কারণে বেশী মানুষ নিহত হয়েছে? ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বার্থে সৃজিত লৈংগিক রাজনীতি তথা লিংগের ভিত্তিতে পরিচয় নির্ধারণের কারণে দাস সমাজের শুরু হতে এখন পর্যন্ত কত সংখ্যক নারী আহত- নিহত ও অত্যাচারিত হয়েছে বা কত সংখ্যক পুরুষ একদিকে যেমন স্ত্রীর সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়ে পুরুষের আধিপত্য বহাল রাখতে স্ত্রীকে যেমন অত্যাচার করেছে ও করছে স্বামী তেমন স্বামী নিজেও সন্তান তথা পরিবারের জন্যও বিষাক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে নিজেই অশান্তি ও অবিশ্বাসের আগুনে জ্বলে-পুড়ে ছারখার করছে নিজের জীবন তার কি কোনো পরিসংখ্যান কোনো শাসক দিতে পারবে অথবা, কত সংখ্যক নারী পারিবারিক গন্ডী থেকে বের হতে বা প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বা স্বামীর অবিশ্বাসী হয়ে বা নিজেকে সম্ভোগের সামগ্রী বিবেচনায় বেশী দামে নিজেকে বিক্রি করতে গিয়ে স্বামী বা প্রেমিকের সাথে প্রতারণা করে ক্ষেত্র বিশেষ নিজের সহ কতজনের মৃত্যু বা দুর্ভোগের কারণ ঘটিয়েছে তার কোনো পরিসংখ্যান কি কোনো শাসক তৈরী করেছে ? অথবা, ব্যক্তিগত মালিকানা হতে সৃষ্ট জাতিগত বা সম্প্রদায়গত বিরোধবৈরীতা, সংঘাত -দাঙগা ও যুদ্ধে দুনিয়ার কত সংখ্যক মানুষ নিহত ,

আহত ও বাস্তচ্যুত হয়েছে তার হিসাব কি কোনো শাসক দিয়েছে?

রাষ্ট্রের অন্তিম দশাকে সাম্রাজ্যবাদ বলেছিলেন কমিউনিস্ট মার্কস। কিন্তু পুঁজিতন্ত্রী বিশ্বায়নের যুগে রাষ্ট্র ডিফ্যাংক্ট হয়েছে মানে রাষ্ট্র টিকে থাকার সক্ষমতা হারিয়েছে। তাইতো মাত্র কতিপয় রাষ্ট্র ভেংগে এত্তোগুলো রাষ্ট্রের পত্তন হয়েছে। দাসতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাকারীরা যেমন কথিত মহামানব হিসাবে বিবৃত হয়েছে তেমন একালের কথিত স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকারীদেরও নানান রকম গুণের গুণিন তথা অসাধারণ বলে প্রচার করা হচ্ছে। অথচ, *মানুষেরা সমান তবে অসমতা ও বৈষম্য যতটা বিদ্যমান আছে মানুষদের মধ্যে তাতো আছে বটে ব্যক্তিগত মালিকানার কারণে।*

উল্লেখ্য, রাষ্ট্র জন্ম নিয়ে মানুষ কর্তৃক মানুষকে পরাধীন করে কার্যত সমাজের সকলকেই পরাধীন করেছে। অথচ,একালের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত আবার কথিত সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা রাষ্ট্র ভেংগে বা বিভক্ত করে আরো নতুন নতুন ডিফ্যাংক্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে বলছে স্বাধীনতার আন্দোলন! পুঁজিতন্ত্রীদের রক্ষা করতে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পুঁজিতন্ত্রের পতন হতে পুঁজিতন্ত্রকে রক্ষা করতে পুঁজিতন্ত্রী স্বার্থের সেবক- রাজনীতিকেরা নতুন নতুন রাষ্ট্র গঠনের কাজকে মহান হিসাবে মহিমান্বিত করে দেশপ্রেমের মাদকতার জালে আটকাচ্ছে বটে পুঁজিতন্ত্র বিলীন করে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠাকারী মজুর শ্রেণীকে। তথাকথিত দেশপ্রেমের রাজনীতির মাদকতায় বহুজনকে অবচেতন করতে

পারলেও জাতীয় মুক্তির চালাক-চতুর ও ধূর্ত্য রাজনীতিকেরা কেহই কিন্তু মাতাল হয়নি। তাইতো ওদের কেহ কেহ কেবল ভিন্ন দেশে টাকাই পাচার করে না বরং নিজেদের সন্তানদেরও ভিন দেশে লেখা-পড়া শিখানো সহ ঐ সব দেশে স্থায়ীকরণে নানান অনিয়ম করা ছাড়াও নিজেদের আরাম-আয়েশী জীবন-যাপনের জন্য নানা উন্নততর অর্থনীতির দেশে বাড়ী কিনে বা বানায় ও থাকে এবং নাগরিকত্বও নেয় তবু, ওরা দেশপ্রেমিক! ওসব রাজনীতির কোনো কোনো সফল রাজনীতিক হয়তো বিপুল সংখ্যক মানুষকে জাতীয় মুক্তি তথা দেশপ্রেমের রাজনীতির ডোবায় চুবিয়ে বোকা বানাতে পারার স্বীয় সক্ষমতায় নিজে নিজেই আড়ালে-আবডালে হাসে বটে তাদেরই বানানো বোকা ও বিভ্রান্তদের কায়কারবারে ও হালের দুরাবস্থা দেখে।

কিন্তু, ওরা তথা ধূর্ত্য রাজনীতিকেরা জানে বটে তবে মানতে ও বুঝতে চায় না যে পুঁজির জন্ম শর্তে এবং সূত্রেই পুঁজিপতি শ্রেণীর সাথে পুঁজি উৎপন্নকারী মজুর শ্রেণীর বিরোধের ফলাফলে প্রতিষ্ঠিত হবে মুক্ত ও স্বাধীন মানুষদের মুক্ত সমাজ-কমিউনিজম। উল্লেখ্য, সাবেকী সমাজের শাসকেরা কেহ পরাজিত হতে চায়নি বলে তাদের শাসনাধীন সমাজকে চিরস্থায়ী করতে তারা করেনি হেন কোনো দুস্কর্ম নাই। কিন্তু, না সেই শাসকেরা, না তাদের শাসনাধীন সমাজগুলো এখন টিকে আছে। অতঃপর, যে কারণে দাস ও সামন্ত সমাজ টিকে নাই ঠিক সেই একই করণে তথা সমাজ পরিবর্তনের নিয়ম অর্থাৎ ইতিহাসের নিয়মে পুঁজিতন্ত্রও টিকে থাকার সুযোগহীন ।

সুতরাং,পুঁজিতন্ত্রের পতন ও কমিউনিজমের উত্থান সমান অনিবার্য বটে সমাজ পরিবর্তনের নিয়মে।

কলোনিয়াল শাসকদের শাসনাধীন ভারত কিন্তু ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত আই এম এফের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য। অতঃপর , বৃটিশের পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণীর স্বার্থে দলখীকৃত ভারতের কলোনিয়াল শাসনের "পরাধীন ভারত" আর কথিত স্বাধীন ভারতের সরকারগুলো কিন্তু আই এম এফের চুক্তিপত্র মতোই ডিফ্যাংক্ট রাষ্ট্রের সরকার । ফলে, ১৯৪৫ সাল হতে ভারতের সরকারগুলো বাস্তবায়ন করছে বটে আই এম এফের তৈরীকৃত আর্থিক নীতি। অপরাপর কথিত স্বাধীন রাষ্ট্রতো বটেই এমনকি পূর্বেকার জাতীয় রাষ্ট্র সহ সকল রাষ্ট্র আইএম এফের আর্থিক নীতি কার্যকর ও বাস্তবায়নে দরকার পড়লে আইএমএফের নীতি বিরোধী বা কথিত সংস্কার বিরোধীদের বিশেষত কথিত স্বাধীনতা অর্জনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালনকারী মজুরদেরকে গুলি করে হত্যা করা সহ দমন-পীড়নে লজ্জা বোধে করে না।

১৯৪৭ সালের আগষ্টে ভারত বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটো রাষ্ট্রের পত্তন হয়। তাতে, কলোনিয়াল শাসকদের স্থলে শাসক হয়েছিল ভারতে জন্মগ্রহণকারীরা । কিন্তু, কলোনিয়াল শাসকদের সৃষ্ট আইন, নির্বাহী ও বিচার বিভাগ নিয়ে গঠিত রাষ্ট্রইতো থাকল বটে কথিত সদ্য স্বাধীন পাকিস্তান ও ভারতে। কলোনিয়াল শাসকদের তৈরীকৃত দেওয়ানী কার্যবিধি ও ফৌজদারী কার্যবিধি সহ দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন, সাক্ষ্য আইন, চুক্তি আইন, পুলিশ রেগুলেশন ইত্যাদি

সবইতো প্রায় বহাল ও কার্যকর আছে ভারত,পাকিস্তান ও বাংলাদেশে।

কলোনিয়াল শাসকদের তৈরীকৃত আমলাতন্ত্র এখনো বহাল এবং পুঁজিতন্ত্রের উপযোগী মনুষ্য যন্ত্র তৈরী করতে চিকিৎসা বিজ্ঞান সহ কলোনিয়াল শাসকদের প্রবর্তিত শিক্ষা পদ্ধতিও বহাল আছে। তবে, কলোনিয়াল আমলে ছিল না কিন্তু এখন আছে সংবিধান বর্ণিত রাষ্ট্রবাসীদের মৌলিক অধিকার লংঘন , হানি ও ক্ষুন্নকারী জরুরী আইনের বিধান। তাছাড়াও আছে বিশেষ ক্ষমতা আইন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ইত্যাদি। কলোনিয়াল রুলারদের শাসনামলে ভারতে ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুম ব্যতিত আনরুলী জনতাকে গুলি করতে পারত না পুলিশ তাও আবার গুলি করত হতো হাঁটুর নীচে। কিন্তু, এখন?

বিনা বিচারে হত্যা, গুম ও খুন কি না হচ্ছে? কালোনিয়াল শাসনে প্রণীত কারাবিধি এখনো বহাল কিন্তু তখনকার ১০০০ কারাবন্দীর জন্য নির্মিত জেল খানায় এখন কতজন কারাবন্দী থাকে তাও আবার ভয়ানক গাদাগাদি করে? তা হলে বহুল কথিত স্বাধীন ভারতে কে কে স্বাধীন হয়েছে? তবে, টাটা-বিড়লা, আদানী ও আম্বানীদের পুঁজির বহর বেড়েই যাচ্ছে। আর মজুরদের অবস্থা? শোষণের হার কলোনিয়াল আমল হতে কম তা কিন্তু কেহ ভুলেও দাবী করতে পারবে না। উপরন্ত, শিল্প পুলিশের প্যাদানি সহ ধনীদের পোষ্য গুন্ডাবাহিনীর নির্যাতন, অত্যাচার ও সন্ত্রাসতো এখন স্বাভাবিক। আন্দোলনের নাম নিলেই চাকুরীচ্যুতি, মিথ্যা মামলা ইত্যাদিতো রোজকার রুটিন ওদের। কলোনিয়াল শাসকদের তৈরীকৃত মজুরি পরিশোধ

আইনে নির্ধারিত তারিখে মজুরি প্রদানে ব্যর্থ হলে মজুরী দাতা মালিক পক্ষের জেল জরিমানার বিধান কি এখন হুবুহু কার্যকর আছে?

কলোনিয়াল আমলে ভারতের লোকেরা অখন্ড ভারতে তথা হালের পাকিস্তান ও বাংলাদেশে অবাধে যাতায়ত করত। কিন্তু, এখন কেবল বাংলাদেশের কতসংখ্যক মানুষকে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে ভারতের সীমান্তরক্ষী হত্যা করছে প্রতিবছর?

পুঁজিতন্ত্রী বিশ্বায়নের রাজনীতির হেতুবাদে এবং তথাকথিত জাতীয় মুক্তির রাজনীতির ধ্বজাধারীদের কথিত স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ফলে কেবল ভারত, পাকিস্তান নয় বরং দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরে দুনিয়াময় প্রতিষ্ঠিত সকল রাষ্ট্রের অবস্থা কম-বেশ একই রকম। তবে, ওরা মানে প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতিরা এখনো পর্যন্ত সফলতা দেখাতে পেরেছে দুনিয়ার মজুরদেরকে দেশ-জাতির বোধে ও গন্ডীতে আটক-বন্দী ও আচ্ছন্ন রাখতে পেরেছে বলেই চরম প্রতিক্রিয়াশীল তথা সমাজ পরিচালনায় অক্ষম ও অযোগ্য পুঁজিপতি শ্রেণী যেমন এখনো বহাল আছে তেমন মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্রও টিকে আছে।

কারণ, মজুর শ্রেণীর শ্রেণী চেতনায় দুনিয়ার মজুরেরা এখনো একতাবদ্ধতো হতেই পারেনি এমনকি স্বীয় শ্রেণীর মুক্তির জন্য দুনিয়ার শ্রমিকদের একতা যে শ্রমিকদের মুক্তির প্রথম শর্ত তাও ঠিক-ঠাক ভাবে জানা-বুঝার সুযোগও পাচ্ছে না। অতঃপর, প্রতারক লেনিনেরও কথিত জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার তথা জাতিয় মুক্তির রাজনীতি এখনো বহাল ও জারী আছে বলে

মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্র এখনো টিকে থেকে দুনিয়ার মজুরদেরকে নানান জাতি ও দেশে ভাগ-বিভাগ ও বন্দী করতে সহায়ক হয়েছে বলেই দুনিয়ার শ্রমিকেরা চরম দুর্ভোগ ও দুর্দশার মধ্যে জীবন পাত করছে হেতু কথিত দেশপ্রেম ও জাতীয় মুক্তির বিষাক্ত রাজনীতি দুনিয়ার মজুরদের জন্য প্রকৃতপক্ষেই কেবলমাত্র ভয়ানক ক্ষতিকরই নয় বরং খুবই মারাত্মক এক বিষ বিশেষ।

মজুরদের কোনো জাতি ও দেশ নাই কিন্তু শৃংখল হারিয়ে জয় করার মতো তাদের আছে একটি পৃথিবী- একথা ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহারে একদম ঠিকভাবে বিবৃত হয়েছে। কিন্তু, কথিত দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের অর্থাৎ তথাকথিত জাতীয় মুক্তির রাজনীতি দ্বারা লেনিনবাদীরা সমেত উল্লেখিত রাজনীতির ধারক -বাহকেরা দুনিয়ার মজুরদের শ্রেণী পরিচয় মুছে দিয়ে তাদের শ্রেণী স্বার্থকে অবজ্ঞা ও অস্বীকারই করেনি বরং তাদেরকে দেশজাতির গন্ডিতে বন্দী ও আটক করে মুক্তির জন্য দুনিয়ার শ্রমিকদের একতা গড়ে উঠার ক্ষেত্রে ভয়ানক বাধা ও প্রতিবন্ধকতা তৈরী করছে।

অতঃপর, মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণ-শাসন অর্থাৎ বন্দী তথা পরাধীন করার সকল শিকলের উৎস- সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা বা পুঁজিতান্ত্রিক সম্পত্তি বহাল রেখে; শ্রেণী ও শ্রেণী শোষণ-শাসন বহাল রেখে; রাজনীতি, আদর্শবাদ বা মতাদর্শ , দর্শন ইত্যাদি জারী রেখে; আইন, বিধি-বিধান চালু রেখে; পরিবার ও পারিবারিক শাসন জারী রেখে; উত্তরাধিকার ও অভিভাবকত্ব বহাল রেখে; রাজনৈতিক দল সমেত রাষ্ট্র তথা

দমন-পীড়ন বহাল রেখে; সেনা সহ নানান ধরণের স্বশস্ত্র বাহিনী টিকিয়ে রেখে; শোষণ-শাসনে সহায়ক কোনো রীতি-নীতি, প্রথা-ঐহিত্য ও সংস্কৃতি বহাল রেখে; এবং মানুষে মানুষে ভাগ-বিভাজন ও প্রভেদ এবং বিরোধ -বৈষম্য বহাল রেখে দাস সমাজের শাসকেরা এবং আধুনিক পুঁজিতন্ত্রের শাসকেরা জাতীয় মুক্তি, জনমুক্তি, গণমুক্তি, কৃষক মুক্তি, নারী মুক্তি, গরীব মুক্তি, পাপ মুক্তি, দুঃখ মুক্তি, অর্থনৈতিক মুক্তি, ব্যক্তি মুক্তি ইত্যকার নানান ধরণের মুক্তি ও স্বাধীনতা বিষয়ে যেসব ভূয়া রাজনৈতিক তত্ত্বকথা ও বাণী দিয়েছে তা সবই যে ভুয়া, বানোয়াটি, অসত্য ও মিথ্যা তাতো নিশ্চিত।

অতঃপর, এযাতকাল পর্যন্ত বিবৃত বা দাবীকৃত যত ধরণের মুক্তি ও স্বাধীনতার কথা ওরা তথা শোষক-শাসকেরা বা শোষক-শাসকদের সেবক অর্থাৎ মতাদর্শী, দার্শনিক ও রাজনীতিকেরা বলেছে তা সবই ঝুটা, ঝুটা ও ঝুটা অর্থাৎ ভূয়া, ভূয়া এবং ভূয়া। সুতরাং, সিপিআই'র আজাদীর বক্তব্যও ভূয়া তথা ঝুটা।

শাহ্ আলম

সদস্য,

ইনফরমেশন সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডম।

ঢাকা-০১, জনু, ২০২৩ খ্রীঃ।

মোবাইল: + ৮৮০ ১৭১৫-৩৪৫০০৬.

www.icwfreedom.org

https://www.youtube.com/@EMANCIPATIONWorkers

https://www.blogger.com/blog/posts/8765969704988639346

https://workers emancipation.blogspot.com/